কৃপাগাথা

(পঞ্চবিংশটি আধ্যাত্মিক ঘটনার সংকলন)

BANGLADARSHAN.COM

পম্পা বন্দ্যোপাধ্যায়

॥মুখবন্ধ॥

এখানে বর্ণিত পঁচিশটি গল্পই হয় কোনো মহাত্মার জীবনের ঘটনা নয় আমার ব্যক্তিগত জীবনের ঘটনা, সবগুলোই সত্যঘটনা, শুধু আমি আমার মত করে লিখেছি তথ্যবিকৃত না করে। আমাদের সনাতন ধর্মের গভীরতা এবং আদর্শ যে কতভাবে আমাদের জীবনকে প্রভাবিত করে তার কিছু উল্লেখ করলাম। সুধী পাঠক পাঠিকারা আশা করি এর মর্ম বুঝে যদি একজনও আলোকিত হন, আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াসের সেটাই সাফল্য।

“জ্যোতির্ময়ং দিব্য অনন্তশক্তিং
সংসারসারং হৃদয়েশ্বরঞ্চ,
বিজ্ঞানরূপং সকলার্তিনাশং
শ্রীগুরুদেবং নিতরাং নমামি॥”

BANGLADARSHAN.COM

॥উৎসর্গ॥

গুরুর চরণধূলি নিয়ে
মনমুকুর মালিন্যমুক্ত,
জগন্মাতার মহিমা গাই
সন্তান তাঁর অনুরক্ত।

“সদ্গুরুরূপী ঈশ্বরী শ্রীশ্রীমা সর্বাণীর পুতরাঙাপাদপদ্মে এই গ্রন্থটি নিবেদিত হল মাতৃচরণাশ্রীতা পম্পা বন্দ্যোপাধ্যায়ের, যে জগৎজননীর সতত কৃপা ও অমৃতকরুণাধারা ব্যতীত আমার লেখা সম্ভবই ছিল না।

জয় শ্রীশ্রী মা সর্বাণী, জয় গুরুমহারাজগণ।

BANGLADARSHAN.COM

সূচিপত্র

গল্পের নাম	পৃষ্ঠা সংখ্যা
সাঁই কৃপা	৫
মহাত্মা সুদীন বাবা	৯
দেবী প্রসাদ	১৩
সংস্কার	১৬
যোগশাস্ত্র প্রণেতা	১৯
বহুরূপে ঈশ্বর	২৪
শ্রদ্ধাবানের অনুভবে	২৯
দিব্যত্রয়ীর সঙ্গে সংযোগ	৩২
আলোর সোপান	৩৮
অন্ন দোষ	৪১
আলো বনাম অন্ধকার	৪৪
সত্য বাস্তবের চেয়েও অবিশ্বাস্য	৪৫
অনন্তের ডাক	৪৮
কৃপাময়ীর দিব্যকৃপা	৫৪
সায়াহ্নের অনুভব	৫৯
অন্নদান	৬১
ইষ্টশক্তি	৬৪
মাতৃকৃপার অমৃত ধারায়	৬৯
মহাজীবনের পথে	৮৭
বুদ্ধির বাইরে	৯০
রাধানগরের চাটুজ্জেবাড়ি	৯২
টান বহমান	৯৫
সন্ন্যাসদীক্ষা	১০০
হরিগুণ	১০২
ভক্তবৎসল কেদারনাথ	১০৫

BANGLADARSHAN.COM

॥সাঁই কৃপা॥

মানস ভজ রে গুরু চরণম
দুস্তর ভব সাগর তরণম
গুরু মহারাজ গুরু জয় জয়
সত্য সাইঁ সদ্গুরু জয় জয়।

“পুরাণ অনুসারে অনুসূয়া দেবী অত্যন্ত ধার্মিক ছিলেন এবং সর্বদা অনাড়ম্বর ও নিষ্ঠার অনুশীলন করতেন। এগুলি তাকে অলৌকিক ক্ষমতা অর্জন করতে সাহায্য করেছিল। কাহিনী অনুসারে, অনসূয়া আকাশে ঝড় তুলেছিলেন, দেবতাদের অস্বীকার করেছিলেন এবং মন্দাকিনী নদীকে পৃথিবীতে নামিয়ে এনেছিলেন। তিনি ঋষি কর্দম এবং দেবাহুতির কন্যা ছিলেন। ঋষি কপিল ছিলেন তার ভাই এবং শিক্ষক। হিন্দু ধর্মানুসারে তিনি সতী অনসূয়া অর্থাৎ পবিত্র স্ত্রী অনসূয়া হিসেবে পূজিত হন। তিনি হিন্দু পুরাণের অন্যতম পবিত্র চরিত্র হিসেবে বিবেচিত। অনসূয়া ছিলেন হিন্দু পুরাণে বর্ণিত দুষ্মন্তের স্ত্রী ও সম্রাট ভরতের মা শকুন্তলার প্রিয়সখীদের একজন। মহাসতী অনসূয়া দেবীকে সর্বত্তমা বলে ব্রহ্ম, বিষ্ণু ও মহেশ্বর, তিনজনেই তাঁদের স্ব স্ব পত্নীদের কাছে বর্ণনা করায় তিনজনেরই পত্নীত্রয় একসঙ্গে তিনজনকে তাঁদের স্ব স্ব পত্নীদের কাছে বর্ণনা করায় তিনজনেরই পত্নীত্রয় একসঙ্গে তিনজনকে অনসূয়াদেবী সমীপে প্রেরণ করেন তাঁদের বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণ করতে। তিন আদিদেবদের অতিথি হিসেবে দেখে অনসূয়াদেবী জানতে চান যে তিনি কি ভাবে তাঁদের সেবা করলে তাঁরা সন্তুষ্ট হবেন। তিন দেবতাই ইচ্ছা প্রকাশ করেন মাতা অনসূয়াদেবীর স্তন্য পান করার। তিনজনের ইচ্ছা জেনে তাঁদের পাদ্যঅর্ঘ্য দিয়ে আসন গ্রহণ করতে বলে দেবী তাঁর স্বামী অত্রিমুনিকে স্বরণ করে দেবতাদের ইচ্ছের কথা ব্যক্ত করেন। অনন্তযোগিবিভূতির অধিকারী অত্রিমুনি তখন অনসূয়াদেবীকে বলেন যে তিন দেবতাদেরই গায়ে অত্রিমুনির কমন্ডুলু থেকে জল দিয়ে বলতে, “বাল ভব”, অনসূয়া দেবী তাই করেন এবং তিন দেবতাই বালক রূপ প্রাপ্ত হন। অনসূয়া দেবী এইবার তিনজনকেই আপন ক্রোড়ে নিয়ে স্তন্য দান করলে, তিনজনেই স্তন্য পানে তৃপ্ত হয়ে নিদ্রিত হন। এদিকে তিন দেবতাদের দেরী দেখে তাঁদের পত্নীদের আগমন ঘটে অনসূয়া দেবীর কুটিরে। তাঁদের দেখে অনসূয়াদেবী তাঁদের আগমনের হেতু জানতে চাইলে তাঁরা ব্যক্ত করেন যে তাঁদের স্বামীদের অন্বেষনেই তাঁরা এসেছেন, তখন অনসূয়াদেবী তাঁদের ঘরে এনে দেখান তিন দেবতা তিনটি বালক রূপে তাঁর গৃহে নিদ্রিত। দেবীত্রয় নিজেদের ভুল বুঝে তাঁদের পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দিতে অনুরোধ করলে আবার অত্রিমুনিকে স্মরণ করে তাঁর কমন্ডুলু থেকে জল দিয়ে প্রার্থনা করলে তাঁরা স্ব স্ব রূপ ফিরে পেয়ে অনসূয়াদেবীকে বর প্রার্থনা করতে বলেন। অনসূয়াদেবী তিনজনকেই তাঁর পুত্ররূপে চান। তাঁরা সেই বর দিয়ে প্রস্থান করার পর এই তিন আদিদেবরা তিনি ত্রিমূর্তি-ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এরা ঋষি অবতার দত্তাত্রেয়; শিবের অবতার একরোখা-রাগান্ধ ঋষি দুর্বাসা এবং ব্রহ্মার অবতার চন্দ্রাত্রি ত্রয়ীকে পুত্র রূপে লাভ করেন। তিনি চন্দ্রদেব চাঁদের মাও ছিলেন। শ্রীদত্তাত্রেয় ঋষি ধরায় আসেন লোককল্যাণের ব্রত নিয়ে। ঋষি

BANGLADARSHAN.COM

দত্তাত্রয়ের সত্তার পরের জন্ম শিরডির শ্রীসাঁইবাবা যিনি নিজেও আবার আসেন লোককল্যাণের জন্য। শিরডি সাঁইবাবার আরব্ধ কর্মের কিছুটা করার জন্য আসেন পুত্তাপার্থির শ্রীসত্য সাইঁ বাবা আর হায়দরাবাদের শ্রীশিবতেজা বাবা। এই সত্যসাইঁ বাবার কথাই আলোচনা করে গঙ্গা জলে গঙ্গাপূজা করবো।”

বেহালার নিজের হবু শ্বশুর বাড়িতে প্রথম দিন এসে খুব অবাক হলাম। তখনো আমাদের বিয়ে হয়নি, কোনো একটা পুজো বলে আমাকে আমার হবু স্বামী এনেছেন তাঁদের বাড়িতে। সিঁড়ির শুরু থেকে সমস্ত ঘরে ভর্তি সত্যসাঁই বাবার ছবি আর বাণী লাগানো। সংকোচ কাটিয়ে জিজ্ঞেস করে ফেললাম ব্যাপারটা। যা শুনলাম তাকে বিশ্বাস করতে মন চায়, কিন্তু যুক্তিবাদী মস্তিস্ক মেনে নিতে পারেনা। শুনলাম আমার শাশুড়ি মায়ের জীবন দান করেছেন সত্যসাঁই বাবা।

আমার মনে পড়ে গেল আমার জীবনে সত্যসাঁই বাবার সঙ্গে সংযোগ। তখন বোধহয় বছর পাঁচেক বয়েস। মায়ের সঙ্গে মায়ের ছোটকাকিমার, যাকে আমি ছোড়দিদা বলতাম, তাঁদের শরৎ বসু রোডের বাড়িতে গেছি দুর্গাপুর থেকে ছুটিতে এসে। তিনতলা বাড়ির দোতলাতে ঠিক সিঁড়ির মুখে তাঁদের বিরাট ঠাকুরঘর আর সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে যাঁর ছবি চোখ টানে সেটা সত্যসাঁই বাবার একটা বিশাল ছবি, যে ছবিতে অহরহ বিভূতি আর মধু পড়ে চলেছে আর ঘরটা, সিঁড়ি আর বাইরেটা একটা অপূর্ব সুগন্ধে ভরে রয়েছে। প্রথম দেখে শিশু মনে খুব প্রভাব পড়েছিল যার ফলস্বরূপ ছোড়দিদা মাকে সত্যসাঁই বাবার একটা ছবি দেন যেটা আমাদের ঠাকুরের আসনে আমার আঠারো বছর বয়েস পর্যন্ত ছিল। তারপর মা কোথাও পড়েন যে পরে জাদুকর পি সি সরকার নাকি প্রমাণ করে দিয়েছেন সত্যসাঁই বাবা ম্যাজিক করেন, সেটা দেখে আমার মাতৃদেবী ছবিটা সরিয়ে দেন ঠাকুরের আসন থেকে। সেটা আমার আবার মানতে খুব কষ্ট হয়েছিল কারণ আমি প্রত্যেক পরীক্ষার আগে সত্যসাঁই বাবাকে স্মরণ করে যেতাম এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সফল হতাম।

BANGLADARSHAN.COM

এবার আস্তে আস্তে আমার বিয়ের পরে জানলাম সত্যসাঁই বাবার আমার শাশুড়ি মায়ের জীবন দান করার ঘটনা। আমার শাশুড়ি মা, শ্রীমতী অর্চনা দেবী, প্রথমবার অন্তঃসত্ত্বা থাকাকালীন আক্রান্ত হন কার্ডিয়াক asthma তে। এবং একে একে তার চার ছেলে মেয়ে, তিন ছেলে আর এক মেয়ে, হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর এই কষ্ট উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে। শেষে ওঁর এমন অবস্থা দাঁড়ায় যে উনি একদম শয্যাশায়ী হয়ে যান। সেটা ১৯৭৬ সাল। এই সময় ওঁর শ্বাস কষ্ট এতটা বাড়ে যে ডাক্তাররা বলে দেন যে আর মাত্র কয়েকমাস উনি বাঁচবেন। মানে ডাক্তাররা জবাবই দিয়ে দেন। আমার শ্বশুরমশাই শ্রী অশোক কুমার ব্যানার্জী ছিলেন শিপিং কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়ার চিফ মেরিন ইঞ্জিনিয়ার। শাশুড়ি মায়ের এই অবস্থা জেনে উনি SHORE JOB নিতে বাধ্য হন ছেলে মেয়েদের দেখা শোনার জন্য এবং কলকাতায় পোস্টিং নেন অনেক কম বেতনে।

এরপর এক রাত্রে শাশুড়ি মা স্বপ্ন দেখেন যে সত্যসাঁই বাবা ওঁকে ডাকছেন ওঁর কাছে। সকালে উঠে উনি শ্বশুর মশাইকে সে কথা বলেন। শ্বশুরমশাই কথাটা হেসে উড়িয়ে দেন। সেদিন রাত্রে শ্বশুরমশাই একই স্বপ্ন দেখেন যে সত্যসাঁই বাবা ওঁকে ডাকছেন। পরেরদিন উনি সপরিবারে ওঁদের গুরু শ্রীসুদীন বাবাকে (আদ্যাপীঠের

সংঘগুরু শ্রীসুদীন কুমার মিত্র যিনি মাতৃ সেবক সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন আদ্যামায়ের আদেশে) গিয়ে সব কথা বলে জানতে চান কি করা উচিৎ। সুদীন বাবা বলেন সত্যসাঁই বাবা খুবই বড়ো আধ্যাত্মিক শক্তি সম্পন্ন সাধক যিনি লোককল্যাণের জন্যই কাজ করে যাচ্ছেন এবং তাই শাশুড়ি মা আর ছেলে মেয়েদের নিয়ে সত্যসাঁই বাবার কাছে যেতে বলেন বাবাকে। ছেলে মেয়েদের নিয়ে যেতে বলেন আরো এই কারণে যে যদি শাশুড়ি মায়ের কিছু হয়ে যায়, ছেলে মেয়ে শেষ দেখাটা দেখতে পাবে।

শ্বশুরমশাই অফিসে গিয়ে একমাসের ছুটির আবেদন করেন কিন্তু অফিসে ছুটি মঞ্জুর হয়না, নিরুপায় হয়ে উনি চাকরিতে ইস্তফা দেন। এইবার ওঁর উপরওয়ালা ভদ্রলোক বিচলিত হয়ে জানতে চান যে উনি কেন এতদিনের ছুটি চাইছেন। শ্বশুরমশাই তাঁকে বাড়ির আনুপূর্বিক পরিস্থিতি বললে সেই উপরওয়ালা ভদ্রলোক সঙ্গে সঙ্গে ছুটি মঞ্জুর করে দেন। অফিস থেকে বেরিয়ে শ্বশুরমশাই যান ট্রেনের টিকিট বুক করে সিট রিসার্ভ করতে হাওড়া স্টেশন। গিয়ে দেখেন যে মাদ্রাজ মেইলের সব টিকিট শেষ। হতাশ হয়ে যখন বেরিয়ে আসছেন তখন একজন ভদ্রলোক ওঁকে ডেকে বলেন যে ওই ভদ্রলোকের ছয় জনের সিটিং রিসার্ভ টিকিট রয়েছে যেটা উনি বিক্রি করতে এসেছেন ওঁর বাড়িতে কিছু সমস্যা হয়েছে বলে, সেই ছটা টিকিট উনি আমার শ্বশুরমশাইকে বিক্রি করেন।

BANGLADARSHAN.COM

যে সময়ের এই ঘটনা তখনো যশোবন্দপুর স্টেশনই হয়নি, ট্রেন তো হয়ইনি। সেই সময় Puttaparthi যেতে হলে মাদ্রাজ মেইল এ মাদ্রাজ পর্যন্ত গিয়ে ওখান থেকে ১২ ঘণ্টা বাসে করে গিয়েPuttaparthi পৌঁছতে হতো। দুদিন পরে সকলকে নিয়ে বাবা মানে শ্বশুরমশাই ট্রেনে উঠলেন কিন্তু শাশুড়ি মা তো বসে থাকতেই পারছেন না। অতএব ঠিক হলো মেয়ের কোলে মাথা দিয়ে মা শুয়েই যাবেন, ছেলেরা আর বাবা সুবিধেমতো বসে নেবেন মাঝে মাঝে।

এই ভাবে মাদ্রাজ পৌঁছে ওঁরা বাসে উঠলেন, বাস কিছু যাওয়ার পর বাসের কন্ডাকটর বললেন যে সত্য সাঁইবাবা Puttaparthiতে নেই, ব্যাঙ্গালোরে চলে গেছেন। বাড়ির সকলেরই খুব মনখারাপ হয়ে গেল। রাত প্রায় নটার সময় বাস যখন পুত্তাপুত্তি ঢুকছে তখন এক অন্ধ ভিখারী উঠলো বাসে ভিক্ষা করতে, সে খবর দিল এইমাত্র বাবা ফিরে এসেছেন। যাইহোক, ওখানে নেমে একটা ঘর ভাড়া করে রাতটা কাটালো সকলে। পরেরদিন সকালে মাকে শুইয়ে নিয়ে ওঁরা পৌঁছলো বাবার দর্শনের জন্য। মেয়েদের লাইনের দিকে মাকে শুইয়ে আর মেয়েকে মায়ের কাছে রেখে ছেলেদের দিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বাবা আর তিন ছেলে গিয়ে দাঁড়ালো।

সত্য সাঁইবাবা নামলেন, আস্তে আস্তে এসে মেয়েদের দিকে গেলেন, মাকে হাত ধরে ডাকলেন, “এ বাঙ্গাল, উঠ, আন্দার যা।” যে মা বসতেই পারছিলেন না, তিনি উঠলেন, মেয়ের হাত ধরে আস্তে আস্তে দাঁড়ালেন, তারপর আস্তে আস্তে হেঁটে হেঁটে ভেতরের ভিসিটিং রুমে গিয়ে বসলেন। সত্যসাঁই বাবা এবার ছেলেদের দিকে এসে ওই ভিড়ের মধ্য থেকে বাবা এবং তাঁর তিন ছেলেদের আলাদা করে প্রত্যেককে ডেকে নিয়ে ভেতরে

গেলেন। একটু পরে ওঁদের সবাইকে নিজের ঘরে ডাকলেন, ডেকে বাবাকে প্রথম বললেন যে মা যখন বলেছিলেন সত্যসাঁই বাবার স্বপ্নের কথা বিশ্বাস হয়নি তো। বাবা চুপচাপ শুনলেন, এইবার উনি হাত ঘুরিয়ে রূপোর শিবলিঙ্গ তৈরী করে মাকে দিলেন আর বললেন পরেরদিন শুক্রবার, ওইদিন স্নান করে মা যেন ওটা গলায় পরে নেন। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, যে মা শ্বাস কষ্টে শুয়ে পড়েছিলেন, তিনি ওখান থেকে হেঁটে হেঁটে সেই ভাড়া বাড়িতে ফিরলেন। এই যে উনি এইভাবে ডেকে নিয়ে গিয়ে মাকে জীবনদান করলেন, তাঁর বিনিময়ে একটা কোনো কিছু কিন্তু চাননি বা নেননি। এই ঘটনা যখনকার তখন আমার শাশুড়ি মায়ের বয়েস ৪৩, এখন উনি ৮৭, এখনো জীবিত। আর ওখান থেকে ফিরে এসে বাবা টানা দশ-বারো বছর বাড়িতে দরিদ্র নারায়ণ সেবা করিয়েছিলেন। আর বেহালার প্রথম সাঁই ভজন শুরু হয় আমার শ্বশুরবাড়িতে।

Puttaparthi গেলে বোঝা যাই সত্যসাঁই বাবার মানব সেবা ধর্ম কতখানি বিস্তারিত। অন্ধ্রপ্রদেশের অনন্তপুর জেলার ছোট্ট একটা প্রত্যন্ত গরিব জল কষ্টে বিপর্যস্ত গ্রামকে উনি এই সেবা ধর্মকে ব্রত করে আজ যেখানে নিয়ে গেছেন, চোখে না দেখলে বিশ্বাস হবে না। শ্রেষ্ঠ হাসপাতালে, শ্রেষ্ঠ শিক্ষাব্যবস্থা, শ্রেষ্ঠ পরিসেবা চব্বিশ ঘণ্টা পানীয় জল, সব দিক দিয়ে আজ Puttaparthi আজ যেকোনো উন্নত নগর প্রশাসনের একটা রোল মডেল। ওঁম সাঁই রাম।

BANGLADARSHAN.COM

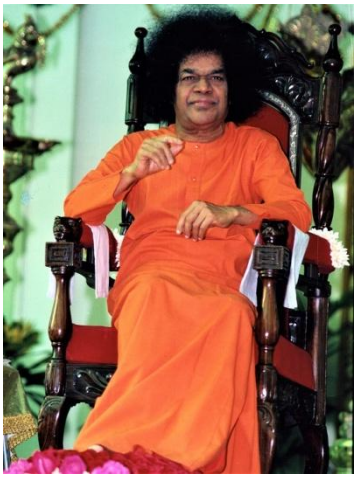

॥মহাত্মা সুদীন বাবা॥

"পথে চলে যেতে যেতে কোথা কোন্‌খানে
তোমার পরশ আসে কখন কে জানে॥"

আমার পরমপূজ্যা গুরুমায়ের কথায়, 'কোনো মহাত্মার লেখা পড়লে সেই মহাত্মার আশীর্বাদ আর প্রজ্ঞা প্রাপ্তি হয়।" বিয়ের বহু বছর আগে থেকে যে স্তবটি নিত্য পাঠ করতাম, সেটি আদ্যাস্তব। আমাদের কসবার আদ্যা মন্দিরে আমার ছিল নিয়ত আনাগোনা কারণ আদ্যামাকে আমার খুব আপন মনে হয় আর যদিও ওখানে মায়ের মূর্তিটি সাধক বামাক্ষেপার মানসপুত্র সাধক জ্ঞানানন্দদাস তীর্থাবধূতের ধ্যানমূর্তি, কিন্তু পুজো হয় আদ্যাস্তব পাঠ করে। বিয়ের পরে শ্বশুরবাড়ির ঠাকুরঘরে একটি ছেঁড়া বই হাতে আসে, যেখানে বেশ কিছু ব্যতিক্রমী কথা চোখে পড়ে, শাশুড়ি মা বললেন যে বইটি ওঁদের গুরুদেব আদ্যাপীঠের সজ্ঘগুরু শ্রীসুদীনকুমার মিত্রের রচিত "পথের সাথী।" পুরো বইটি খুব পড়ার ইচ্ছা হল, কিন্তু বাড়ির বইটির পাতাগুলো অনেক পুরোনো, তাই ছাপাগুলো অস্পষ্ট। শাশুড়ি মা, আমার বর সকলের কাছ থেকে জানতে পারলাম যে শ্রীসুদীনবাবা একজন উচ্চ কোটির অবতারকল্প তন্ত্রসাধক ছিলেন, যিনি লোককল্যাণের মহান ব্রত নিয়ে মানব সেবার জন্য "মাতৃ সেবক সংঘ" প্রতিষ্ঠা করেন, পেশায় ছিলেন সেন্ট্রাল কাস্টমসেরটপ ক্লাস গেজেটেড অফিসার। অত্যন্ত উদার, সংস্কারমুক্ত, অপরিমেয় যোগৈশ্বর্যের অধিকারী এবং ব্যতিক্রমী চিন্তাধারার এই মানুষটি সম্পর্কে জানার আগ্রহ আমার বেড়ে যায়। এরপরে বেহালার আদ্যামন্দিরে যাই আমরা, ওখান থেকে বেরোনোর সময় চোখে পড়ে শ্রীসুদীনবাবার একটি বড়ো ছবিতে মালা পরানো একদম সামনে। আমি আগ্রহী হয়ে ওখানকার অফিসে জিজ্ঞেস করি যে ওরা ওখানে ওঁর "পথের সাথী" বইটি রাখেন কিনা। ওরা আমাকে বেহালার "তপস্যা" যোগকেন্দ্রে খোঁজ নিতে বলে। ঐদিনই ফেরার সময়ে "তপস্যা" যোগকেন্দ্রে গিয়ে খোঁজ করলে ওরা বলে যে ওখানেও ওই বই নেই। বেরিয়ে আসছি, এমন সময় ভেতর থেকে এক ভদ্রলোক আমাদের ডাকেন, ভেতরে গেলে জিজ্ঞেস করেন যে আমি কিভাবে "পথের সাথী"র খোঁজ পেয়েছি, ওঁজে জানাই যে শ্রীসুদীনবাবার দীক্ষিত আমার শ্বশুর, শাশুড়ি ও ননদ। উনি জানান যে ওঁর নাম শ্রীতাপস দেবরায়, উনি বহু সাধুমহাত্মার সঙ্গ করেছেন, উনি একজন নামকরা ফটোগ্রাফারও, উনি আমাকে একটি নির্দিষ্ট দিনে যেতে বললেন, সেদিন উনি বইটা এনে দেবেন। নির্দিষ্ট দিনে গেলাম, সত্যিই উনি বইটা এনেছিলেন, আমায় দিলেন কিন্তু শত অনুরোধেও কোনো মূল্য নিলেন না, উল্টে বইটিকে উপহার স্বরূপ নিজের নাম লিখে আমায় দিয়ে দিলেন। আমি খুবই অবাক হলাম। বইটা আজও আমার কাছে রয়েছে।

এরমধ্যে শ্রীসুদীন বাবার সম্পর্কে কিছু কথা বাড়িতে শুনলাম, আমার শাশুড়িকে যখন স্বপ্নাদেশ দিয়ে শ্রীশ্রীসত্যসাঁইবাবা জীবনদান করার জন্য ডেকে পাঠান পুত্তাপুত্তিতে, তখন শ্রীসুদীনবাবার কাছে আমার শ্বশুরমশাই অনুমতির জন্য যান, শ্রীসুদীনবাবা সঙ্গে সঙ্গে অনুমতি দিয়ে বলেন যে সাঁইবাবা একজন উচ্চকোটির মহাত্মা, উনি ডাকলে যাওয়াই উচিৎ। আমার বরের হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষার আগে দেখা হতে

BANGLADARSHAN.COM

ওকে বলেছিলেন, "চোখবুজে ফার্স্ট ডিবিশন, শুধু কেমিস্ট্রিটায় একটু মন দিতে হবে।" কারণ ও কেমিস্ট্রি বই ছুঁত না। নানা সময়ে উনি বিভিন্ন ভাবে সদুপদেশ দিয়ে আমার শ্বশুরবাড়ির সকলকে দিশা দেখিয়েছেন।

এরপরে আমি ওঁর "পথের সাথী" পড়লাম। বইটার শুরুতেই উনি বলেছেন, "মানুষ শব্দের প্রথম অক্ষরটাই যে 'মা।' তাই মানুষকে উপেক্ষা করে কখনো মাকে পাওয়া যায় না।" ওঁর লেখায় প্রথম পড়লাম, "মাতৃপূজায় উপবাস নিষিদ্ধ, অভুক্ত সন্তানের পূজা মা গ্রহণ করেন না।" উনি আরো বলেছেন, "মাসের মধ্যে তিনদিন বা চারদিন মায়েদের পূজাপাঠে ঠাকুর স্পর্শ করার ব্যাপারে বেশ কিছু কুসংস্কার চলে আসছে। অথচ হাজার হাজার মানুষ দৌড়োচ্ছেন কামাখ্যার মন্দিরে মাতৃযোনির মহাতীর্থে, আর রজঃস্বলা মায়ের রক্তবস্ত্র রক্ষাকবচ ধারণ করে ফিরে আসছেন তাঁরা। এরপরেও মায়ের পূজাপাঠের ব্যাপারে কোন বিধিনিষেধ আরোপ করবার কোনো অধিকার নেই, তাই মায়েরা রজঃস্বলা অবস্থাতেও পূজা-পাঠ করবেন, ঠাকুর স্পর্শ করবেন এবং নিত্যনৈমিত্তিক কাজকর্ম করবেন। মেয়েরাই হচ্ছেন মায়েরা-যাঁরা নিজেরাই ব্রহ্মময়ী মা, আদ্যাশক্তি মহামায়ার অংশ। তাই মায়েদের পূর্ণ অধিকার আছে এবং তাঁরা মহা-ওঁ-কার ধ্বনিতে মহামায়া ব্রহ্মময়ী মাকে ঘরে ঘরে, ঘটে ও পটে, চেতন ও অচেতন মনে, সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারেন (পথের সাথী...পৃষ্ঠা ৪১) উনি বলেছেন "সংযম মানে সদ্গুণের আগমনী সঙ্গীত, আত্মক্ষয় নয়।" এইরকম সংস্কারমুক্ত, যুক্তিবাদী যাঁর চিন্তাধারা তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা তো স্বাভাবিক।

BANGLADARSHAN.COM

আমি ওঁর "পথের সাথী" পড়ে ভীষণ প্রভাবিত হই, একদিন খুঁজে খুঁজে গিয়ে হাজির হই ওঁর চক্রবেড়িয়া রোডের "মাতৃ সেবক সংঘ" আশ্রমে আর কিনে আসি ওঁর কিছু ফটো আর ওঁর লেখা বই। সেই সব বই থেকে জানতে পারি ওঁর তারামায়ের অংশোদ্ভুত রাঙা মায়ের সঙ্গ করার কথা, ওঁর তারাপীঠের সাধনা করার কথা, আদ্যামায়ের স্বয়ং এসে ওঁকে দীক্ষা দেবার কথা, আদ্যামায়ের আদেশে "মাতৃ সেবক সংঘ" প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্য। আদ্যাপীঠের আদ্যামায়ের সামনে গিয়ে কেউ দর্শন করতে পারেননা, দূর থেকে সামনের মন্দিরে চাতালে দাঁড়িয়ে আদ্যামাকে দর্শন করতে হয়, আদ্যামা শ্রীসুদীনবাবাকে আদেশ দেন ওই মন্দির প্রতিষ্ঠা করতে যেখানে ভক্তের চোখের সামনে মা থাকবেন, কোনো দূরত্ব থাকবে না মা আর সন্তানের মধ্যে। শ্রীসুদীনবাবার অলৌকিক যোগ ঐশ্বর্যের জীবন্ত দলিল তাঁর "অবিশ্বাস্য সত্য" বইটি। আমার খুব আক্ষেপ হয় যে ওঁকে সশরীরে দর্শন করার আমার সৌভাগ্য হল না। এরপরে আমাদের গুরুমায়ের কাছে শ্রীসুদীনবাবার কথা বলতে উনিও খুব শ্রদ্ধার সঙ্গে ওঁকে স্মরণ করেন এবং দেখি আমাদের গুরুমায়ের আশ্রমের গ্রন্থাগারেও সযত্নে শ্রীসুদীনবাবার লেখা বই সংরক্ষিত রয়েছে।

এর মধ্যে আমরা বেশ কয়েকবার তারাপীঠে গেছি, একবার তারাপীঠে মায়ের মন্দির থেকে বেরিয়ে ফিরছি, মেয়ে হঠাৎ দেখাল একটি মন্দিরে দিকে যার গঠন শৈলী একটু অন্যরকম, আমরা সেই মন্দিরটিতে গিয়ে দর্শন ও প্রণাম করে বেরিয়ে আসছি, হঠাৎ সামনের অফিস ঘর থেকে এক ভদ্রলোক আমাদের ডাকলেন। অফিসে ঢুকেই চোখে পড়লো শ্রীসুদীনবাবার সেই বড়ো ছবি। আমি ওখানকার ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করলাম যে এখানে শ্রীসুদীনবাবার ছবিটা কেন রয়েছে? ভদ্রলোক সঙ্গে সঙ্গে আমাদের নিয়ে গেলেন অফিসের পেছনের একটি

ঘরে যেখানে রয়েছে একটি পঞ্চমুন্ডীর আসন, ভদ্রলোক দেখালেন যে শ্রীসুদীনবাবার পঞ্চমুন্ডীর আসনসহ যাবতীয় তন্ত্রচর্চার জিনিস শ্রীসুদীনবাবা ওই আশ্রমের যিনি প্রতিষ্ঠাতা, সত্বাধিকারী ও প্রখ্যাত জ্যোতিষী তাঁকে দিয়ে গেছেন, এবং সেই জিনিসগুলির মধ্যে একটি নরকরোটি আছে যেটি নাকি তন্ত্র সাধনার সময়ে জেগে উঠে খেতে চায় আর তাকে উপযুক্ত খাদ্য সরবরাহ করতে হয়। দেখে প্রণাম করে বিদায় নিলাম আমরা।

আজও আমাদের ঠাকুরের আসনে আদ্যামায়ের যে ছবিটা পূজিত হয়, সেটা শ্রীসুদীনবাবার দেওয়া আর শ্রীসুদীনবাবা রয়েছেন এক অদেখা অভিভাবক হয়ে আমাদের পরিবারের সঙ্গে।

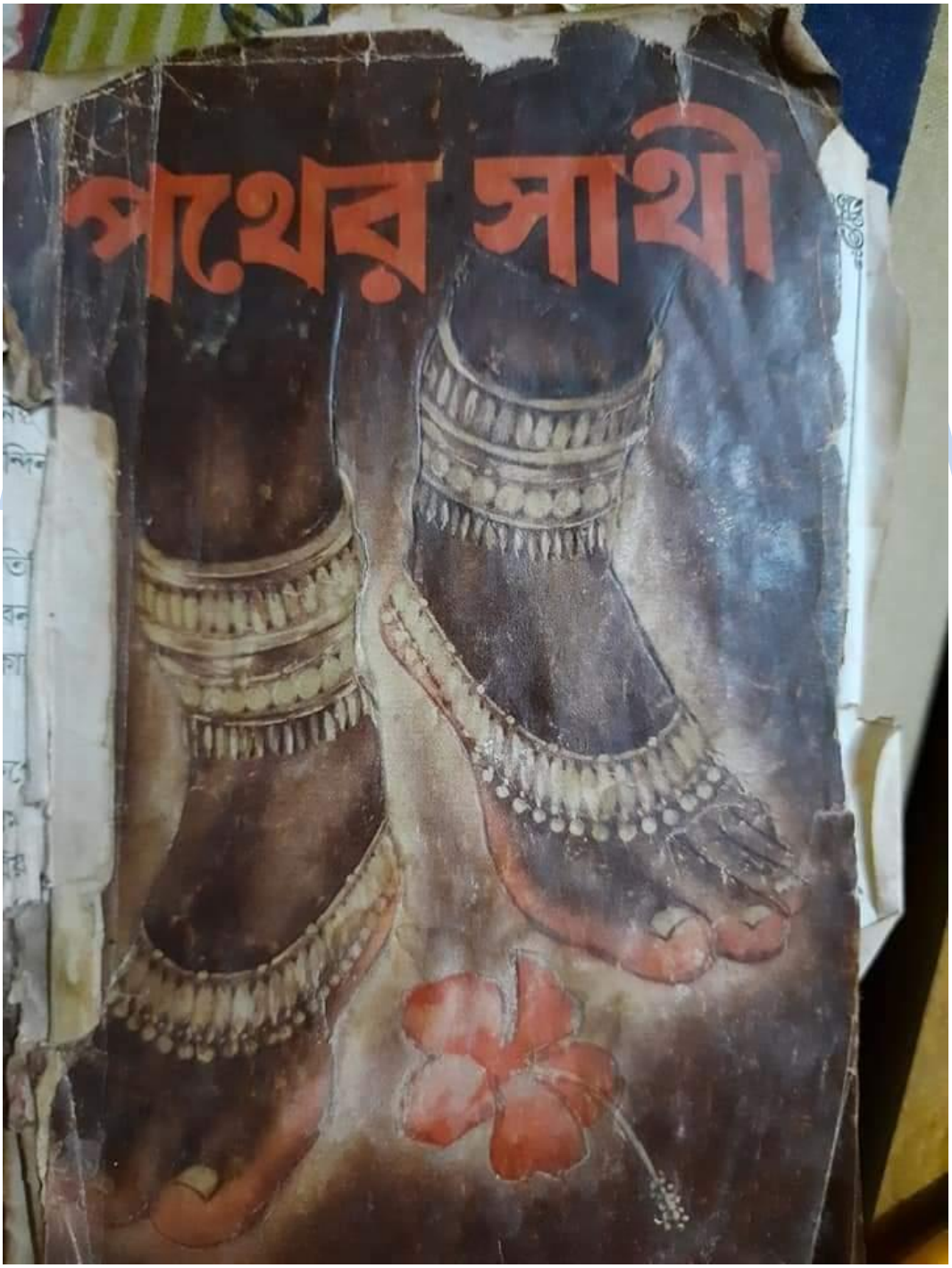

BANGLADARSHAN.COM

শ্রীসুদীন বাবা

ধর্ম আর কর্ম চলে হাত ধরাধরি করে গাঁটছড়া বাঁধা বর বৌ-এর মত। একটানা ধর্মহীন কর্ম একঘেয়েমিতে পর্য্যবসিত হয়। আবার শুধু একটানা ধর্মাচরণ আনে বিরক্তি।

॥দেবী প্রসাদ॥

ষাটের দশকের উত্তরকাশী। একদম নির্জন, অপূর্ব প্রাকৃতিক শোভা সম্বলিত এক অতি প্রাচীন জনপদ গাড়োয়াল হিমালয়ের কোলে। ভাগীরথীর তীরঘেঁষে বসে আছেন দুর্গাদাস। বিষাদ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বসে ভাবছেন নিজের অদৃষ্টের কথা। শান্ত সুন্দর, কাশীরই হিমালয়ের সংস্করণ যেন উত্তরকাশী। এখানে আছে ভাগীরথী, আছে অসি আর বরুণা নদী, আছে বিশ্বনাথের মন্দির, আছে প্রাচীন শাস্ত্র অধ্যয়ন ও পাঠের সংস্কৃত চতুষ্পাঠী আর আছে হিমালয়ের শৈলশিরা তাদের উত্তুঙ্গ তুষারের মুকুটে আবৃত করে যা উত্তরকাশীকে করেছে শীতল, নির্মল, পবিত্রতায় মোড়া এক ধ্যানগম্ভীর তীর্থক্ষেত্রে।

বরুণ পর্বতের পাশে বরুণা এবং অসি নদীর সঙ্গমস্থলে এই শহরের অবস্থান। মূল ভূখণ্ডের অধিকাংশই পাহাড়ি, এবং এই অঞ্চলের উপর দিয়ে উত্তরকাশী জেলার অনেক ছোট এবং বড় নদী প্রবাহিত হয়েছে। যার মধ্যে যমুনা এবং গঙ্গা (ভাগীরথী) সবচেয়ে বড় এবং পবিত্র। এই দুই নদীর উৎপত্তিস্থল যমুনোত্রী ও গঙ্গোত্রী (গোমুখ) এই জেলাতেই অবস্থিত। অসংখ্য সাধু সন্ত এখানে বিমুক্তকামী হয়ে সাধনা করেছিলেন আর এখনো করে চলেছেন। পবিত্র এই তীর্থক্ষেত্রকে অর্ধচন্দ্রাকারে বেষ্টন করে বয়ে চলেছে উত্তরবাহিনী গঙ্গা। এই উত্তরকাশীতেই জ্যোতির্ধামের রাজাকে উত্তরাখণ্ডে বৈদিক ধর্ম পুনঃস্থাপনের কাজে আত্মনিয়োগ করার উপদেশ দিয়ে বিদায় নিয়েছিলেন আচার্য শঙ্কর। সেখানে ভাগীরথী তীরবর্তী আশ্রমে বসে আছেন তিনি।

BANGLADARSHAN.COM

সংসারী মানুষ ছিলেন তিনি এই কয়েক বছর আগেও, ছিল পতিব্রতা স্ত্রী, একটি ফুটফুটে কন্যাসন্তান। দারিদ্র ছিল, কিন্তু সংসারে শান্তির অভাব ছিল না। রোজ রাত্রে শুতে যাবার সময় নিজেকে খুব সুখী আর সৌভাগ্যবান মনে করতেন তিনি। সপরিবারে বাস ছিল তাঁর মোক্ষভূমি বারাণসীতে। সারাদিন পরিশ্রম শেষে বাড়ি ফেরার আকুলতা থাকত এক রত্তি ছোট্ট মেয়েটার জন্য। কিন্তু মহামায়া সব সুখ সবার জন্যে লেখেন না। হঠাৎই তিন দিনের জ্বরে মেয়েটা চলে গেল তার দশ বছর বয়সে, মেয়ের শোকে বউও গেল তার ছমাসের মাথায় তাঁকে একেবারে একা করে দিয়ে। যুগপৎ পর পর দুটি শোকে বিহ্বল দুর্গাদাসের আসে জীবনের প্রতি অসম্ভব বীতস্পৃহা। চলে আসেন তিনি হরিদ্বার। সেখানে নিজের জীবন শেষ করতে উদ্যোত হন এবং প্রাণ বিসর্জনের নিমিত্ত দেবপ্রয়াগের গঙ্গার খরস্রোতে ঝাঁপ দিতে যান, কিন্তু মহামায়ার মায়ার জগতে মা মহামায়া তাঁর জন্য কিছু অন্য রকমই নির্দিষ্ট করে রেখে ছিলেন। তাই আত্মবিসর্জনের মুহূর্তে এক সন্ন্যাসী এসে দাঁড়ান তাঁর সংকল্পের পরিপন্থী হয়ে। সন্ন্যাসী তাঁকে নিয়ে চলেন যোশীমঠে। সেখানে তাঁর দীক্ষা হয় সেই সন্ন্যাসীর গুরু শ্রীযুক্তানন্দ আশ্রমের কাছে। শ্রীযুক্তানন্দ আশ্রম তাঁকে ভার দেন উত্তরকাশীর আশ্রমের তত্বাবধানের। তারপরে কেটে গেছে দীর্ঘ বারোটি বছর। দুর্গাদাস মেয়ের শোক ভুলতে মন প্রাণ ঢেলে দেন মাতৃ আরাধনায়। একসময়ে বেশ কিছুদিন তিনি শাস্ত্রীয় সংগীতের চর্চা করেছেন, ছিল কবিতা লেখার বাতিকও। সেইসব তাঁর কাছে ফিরে আসতে থাকে নতুন ভাবে, নতুনরূপে। রোজ তিনি রচনা করে চলেন কিছু কিছু কবিতা, কখনো বাংলায়, কখনো হিন্দীতে আবার মাঝে মাঝে লিখে ফেলেন উর্দু বয়াতও। মনেপ্রাণে নিজেকে নিবেদন করেন ইষ্টপদে,

সারাদিন সকল কাজের মাঝে তাঁর মনপ্রাণ জুড়ে শুধু চলে অজপা ইষ্ট মন্ত্র জপ। তাঁর ব্রহ্মচর্যের বারো বছর হয় অতিক্রান্ত। তাই তাঁকে তাঁর গুরু দেন সন্ন্যাস দীক্ষা, নাম হয় শ্রীদুর্গাদাস আশ্রম। দশনামী সম্প্রদায়ের আশ্রম সম্প্রদায় ভুক্ত হন তিনি।

দিন এগিয়ে চলে, প্রায় তিরিশটা বছর তাঁর কেটে গেল এই আশ্রমে, একদিন সকালে এক মাতাজী আসেন তাঁর আশ্রমে, মাতাজীর বয়স চল্লিশের কোঠায়, অনিন্দ্য সুন্দর মাতৃমূর্তি, দুর্গাদাসজীর মনে হয় যেন তাঁর সেই হারিয়ে যাওয়া মেয়ে এসেছে আবার তাঁর কাছে। মাতাজী নিজে নীতিসিদ্ধা ও উত্তকোটির মহাত্মা, খুবই অল্পবয়সে তিনি অভিষিক্তা হয়েছেন সদ্গুরুর আসনে সন্ত মন্ডলী দ্বারা। মাতাজী স্বয়ং আদ্যাশক্তি মহামায়ার অংশ। তিনি দুর্গাদাসজীকে দিলেন যোগদীক্ষা, দুর্গাদাসজীর দেহ অন্তঃস্থিত চক্রে হল জ্যোতি দর্শন, কিন্তু তিনি যে তাঁর ইষ্টমূর্তিকে দর্শনাভিলাষী। তিনি মাতাজীর কাছে জানতে চাইলেন তাঁর কি ইষ্টমূর্তির দর্শন লাভ কপালে নেই। মাতাজী তাঁকে আশ্বস্ত করে বললেন অবশ্যই হবে তাঁর ইষ্টমূর্তির দর্শন, এরপরে তিনি চলে গেলেন তাঁর নিজ আশ্রমে।

সেদিন দুর্গাপূজার মহাষ্টমী, সকালে সেদিন দুর্গাদাসজীর আশ্রমে হবে কুমারী পূজা, সেই মত আশে পাশের জনপদ থেকে এসেছে বহু মানুষ তাদের পরিবার নিয়ে আশ্রম প্রাঙ্গনে। হঠাৎ দুর্গাদাসজীর চোখে পড়ে একটি ছোট্ট মেয়েকে, অপরূপা সেই কন্যাটির সর্বাঙ্গ জুড়ে যেন বিধাতা অকৃপণ হাতে সৌন্দর্য ঢেলে দিয়েছে। খুব বেশী হলে মেয়েটির বয়স হবে পাঁচ বছর, গৌরবর্ণার দুপায়ে অলক্ত রঞ্জিত, তিলফুল নিন্দিত নাসিকাটি, কোমল টুকটুকে অধরের বুলি এখনো পরিষ্কার হয়নি। অতো ছোট মেয়েটি এসেছে একদল অচেনা লোকের সঙ্গে পুজো দেখতে। দুর্গাদাসজী নিজের সমস্ত মনের মাধুরী ঢেলে মেয়েটিকে সাজিয়ে বসালেন পুজোর সিংহাসনে কুমারী মাতা রূপে। শুরু হল পূজা, ধূপ দীপ প্রজ্বলিত হয়ে উঠলো, ধুনো গুগ্গুলের দিব্যগন্ধে যেন সত্যি একটুকরো স্বর্গ নেমে এল আশ্রম প্রাঙ্গনে। দুর্গাদাসজীর চণ্ডীপাঠের মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে আজ যেন দুর্গাদাসজী নিজের আজ্ঞাচক্রে দর্শন করতে লাগলেন নিজের ইষ্টমূর্তি ওই কুমারী কন্যাটির রূপে। বিভোর হয়ে পূজা করতে করতে এক সময় দুর্গাদাসজী কখন যেন সমাধিস্থ হয়ে বাহ্যজ্ঞানরহিত হয়ে গেছেন, দুচোখে অবিরাম ধারায় ঝরে যাচ্ছে অশ্রু, অন্য কোনো এক অতীন্দ্রিয় জগতে যেন তিনি বিচরণশীল তখন। আশ্রমের অন্য সহযোগীরা শেষ করলেন কুমারী মাতা রূপে। সমস্ত লোক আস্তে আস্তে ফিরে যাচ্ছে, কেটে গেছে আরো চারঘণ্টা, আস্তে আস্তে ব্যুত্থান হচ্ছে দুর্গাদাসজীর সমাধি থেকে, এমন সময় দুটি কোমল বাহুর বন্ধন অনুভব করলেন দুর্গাদাসজী তাঁর গলায়, চমকে উঠে দেখেন সেই মেয়েটি তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে তাঁকে ডাকছে। তিনি চোখ মেললেন, মেয়েটি তাঁকে বলল যে তার সঙ্গীরা সকলে চলে গেছে, দুর্গাদাসজী কি তাকে একটু এগিয়ে দিয়ে আসতে পারবেন? দুর্গাদাসজী সচেতন হয়ে দেখলেন বেলা পড়ে এসেছে, সূর্যদেব অস্তাচলগামী। তিনি উঠে মেয়েটির হাত ধরে চললেন তাকে এগিয়ে দিতে। লোকালয় ছাড়িয়ে একটি পাহাড়ের বাঁকে গিয়ে মেয়েটি হঠাৎ এগিয়ে গেল, দুর্গাদাসজী ত্রস্তপদে ওর হাতটা আবার ধরতে ওই বাঁক ঘুরে মেয়েটিকে আর দেখতে পেলেন না। অনেকক্ষণ খুঁজে মেয়েটিকে না পেয়ে ভগ্নমনে যখন আশ্রমে ফিরলেন তখন তাঁর শরীরে আর

BANGLADARSHAN.COM

শক্তিটুকু অবশিষ্ট নেই। তিনি ভেতরে গিয়ে দেয়ালে হেলান দিয়ে চোখ বুজিয়ে বসলেন যখন তখন আবার তাঁর আজ্ঞাচক্রে সেই কুমারী কন্যার দর্শন হল, তিনি উপলব্ধি করলেন তিনি দেবী প্রসাদ প্রাপ্ত হয়েছেন। তিনি লিখলেন,

"গৌর বর্ণা কুমারী কন্যা,
আলতা লাগানো ছোট্ট পায়ে,
আয় মা সাজাবো মনের মতন
আমারই পরানে যেমন চায়।
শিশুরূপে ওই মায়ের চরণে,
লুটায়ে রহিব অশ্রু ঝরণে,
লীলাময়ীমা আপন খেয়ালে
করিতে লীলা এসেছে ধরায়।
নয়নে মায়ের বিজুরির জ্যোতি
কন্যার রূপে এলো উমা সতী
মৃণাল বাহুতে কোমল পরশ
অসুরনাশিনী তনয়ে তরায়।"

—গুরুদাস আশ্রম রচিত

BANGLADARSHAN.COM

সমগ্র লেখাটি সত্য ঘটনা অবলম্বনে রচিত। বিশেষ কারণে চরিত্রের নাম পরিবর্তিত।

॥সংস্কার॥

সত্তরের দশকের বারাণসী। গঙ্গার কিনারায় হরিশ্চন্দ্র ঘাটের দিকে চেয়ে চুপ করে বসে আছে বিষ্ণুদাস। হরিশ্চন্দ্র ঘাটের প্রজ্বলিত বহ্নিমান চিতাগুলির অগ্নির দিকে চেয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে। দশাশ্বমেধ ঘাটের একটি দিকে ছোট্ট দোকান চর্মকার বিষ্ণুদাসের। বিষ্ণুদাস খুবই দরিদ্র, কোনো রকমে কখনো অর্ধাহারে, কখনো অনাহারে কাটে তার দিন। দশাশ্বমেধ ঘাট নাকি স্বয়ং ব্রহ্মাজী বানিয়েছিলেন বাবা বিশ্বনাথের জন্য আর এখানেই নাকি দশটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন ব্রহ্মাজী, তাই নাকি এমন নাম ঘাটের। এইসব কথা বিষ্ণুদাস শুনেছে কাশীর ঘাটে যে কথক ঠাকুররা কথকতা পড়ে, তাদের কাছে। দারিদ্রের জ্বালায় সে পুণ্যতোয়া মা গঙ্গার দিকে চেয়ে চেয়ে উদাস হয়ে ভাবে কবে যে সে এই নামরূপের দেহখানি থেকে নিষ্কৃতি পাবে, রোজের দুমুঠো খাবারের জন্যে এই কাজটি যেন আর যেন তার ভালো লাগে না। সূর্য অস্তাচলে ঢলে পড়ছেন। আস্তে আস্তে সায়াহ্নের গাঢ় মসি গ্রাস করতে থাকে চরাচর। ঘাটে শুরু হয় লোকসমাগম মা গঙ্গার আরতি দর্শনের জন্যে। কত লোক জড়ো হয়েছে ঘাটে, বাবা বিশ্বনাথের মন্দিরের দিক থেকে এসে দাঁড়ায় গঙ্গারতির পুরোহিতরা। মহাসমারোহে শুরু হয় আরতি, মুগ্ধ বিস্ময়ে আপাময় জনগণ, সাধু, মহাত্মা একাগ্র চিত্তে দর্শন করতে থাকে সেই আরতি। কাশী যে অবিমুক্ত ক্ষেত্র, বাবা বিশ্বনাথ আর মা অন্নপূর্ণার অকৃপণ লীলাভূমি। পুরোহিতদের হাতে ধরা বড়ো পেতলের প্রদীপধারে কেঁপে কেঁপে উঠতে থাকে প্রদীপের অগ্নিশিখা। কাঁসর, ঝাঁঝর, ঘণ্টা বাদনের শব্দের সাথেই কর্পূর, গুগ্গুল, চন্দনের মিষ্টি সুবাসে এক স্বর্গীয় আবহ সৃষ্টি হয় সমগ্র অঞ্চল জুড়ে। বিষ্ণুদাস ধীরে ধীরে গিয়ে আশ্রয় নেয় তার ছোট্ট দোকানটিতে। বিষ্ণুদাসও নির্বাক বিস্ময়ে দেখতে থাকে মা গঙ্গার ওই অপার্থিব বন্দনা। বরুণা আর অসি নদীর তীরবর্তী নৌকোগুলোতে জ্বলে উঠতে থাকে নরম স্নিগ্ধ আলো। আকাশের বুকে জ্বলে উঠতে দেখা যায় তারকারাজি। বড়ো মায়াময় পরিবেশ তৈরী হয় সারা ঘাট জুড়ে। গঙ্গার অপর পাড়েও আবছা দেখা যায় আলোর আভাস।

BANGLADARSHAN.COM

কিন্তু বিষ্ণুদাসের মন বড়ো ভারাক্রান্ত, আজ নিয়ে তিনদিন তার সেভাবে কিছুই রোজগার হয়নি, আগের দুদিন তবু তার সঞ্চয়ে কিছু ছিল, আজকে তাকে গঙ্গোদক দিয়েই পেট ভরাতে হবে মনে হচ্ছে। বিষণ্ণ চিত্তে সে ভাবতে থাকে কাশী তো মা অন্নপূর্ণার লীলাক্ষেত্র, এখানে সকলের অন্নের জোগাড় মা স্বয়ং করেন, মায়ের অন্নক্ষেত্রের মধ্যে থেকেও কি সে মায়ের কৃপা পাবে না? ভাবতে ভাবতে তার দুটি চোখ ভরে উঠল জলে। সে আরো কিছুক্ষণ বসে থেকে ভগ্ন হৃদয়ে প্রস্তুত হয় লোটাটা নিয়ে গিয়ে গঙ্গোদক সংগ্রহ করতে। এমন সময়ে ঠিক তার দোকানের সামনে এসে দাঁড়ায় গঙ্গার ঘাটে রোজ দেখা সেই পাগলীটা। পরনে শতছিন্ন নোংরা পোষাক, জট পড়া উস্কোখুস্কো মাথার কাঁচাপাঁকা চুল, কাঁধে একটা তালিমারা কালো ঝোলা, গা দিয়ে দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে তার, এলোমেলো অসংলগ্ন বকছে সেই বুড়ি পাগলীটা। পাগলী তাকে হাত নেড়ে কাছে ডাকতে থাকে।

একে অভুক্ত, তায় সারাদিনে কোনো রোজগার হয়নি, তার ওপর এই দিনের শেষে কিছু খাবার নেই ক্ষুদার্ত বিষ্ণুদাসের ভাঁড়াবে, বিষ্ণুদাস নিজের ওপরে নিয়ন্ত্রণ হারায়। সে দোকানের বাটালিটা নিয়ে পাগলীকে তাড়া করে, পাগলী কিন্তু একটুও নড়েনা। সে হাত নেড়ে তখনো বিষ্ণুদাসকে কাছে ডাকছে। ক্রুদ্ধ বিষ্ণুদাস এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ায় বাটালি সমেত ওই পাগলীর দিকে প্রহারে উদ্যোত হয়ে। পাগলী তাকে ঝোলা থেকে একটা শালপাতার ঠোঙা মুড়ে তার হাতে দেয়। বিষ্ণুদাস রেগে গিয়ে সেটা জলে ফেলে দেবে বলে গঙ্গার দিকে এগোতে গিয়ে অনুভব করে ঠোঙাটা গরম। সে বিস্মিত হয়ে খুলে দেখে তাতে রয়েছে গরম ধোঁয়া ওঠা পুরী, তরকারি, মিষ্টি আর রাবড়ি। সে বিস্ময় বিমূঢ় হয়ে পাগলীর দিকে দেখে এগিয়ে যেতে চেষ্টা করে কিছু বলার জন্যে, পাগলী ততক্ষনে চলে গেছে তার কাছ থেকে বেশ দূরে, সেখান থেকেই সে ইশারায় বিষ্ণুদাসকে খেয়ে নিতে বলে অদৃশ্য হয়। বিষ্ণুদাস খাবার মুখে দিতে ইতস্তত করছিল পাগলীর নোংরা পোষাকের কথা ভেবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত জয় হয় তার ক্ষুধার। সে খাবার মুখে দেয় এবং অনুভব করে এমন অপূর্ব স্বাদের খাবার সে ইতিপূর্বে কখনো খায়নি। বিষ্ণুদাস চোখের জলে ভাসতে ভাসতে খেতে থাকে।

সেই দিনের সেই ঘটনার পরে বিষ্ণুদাস সেই পাগলীকে আর কিছু বলেনা, কিন্তু পাগলী বিষ্ণুদাসকে নানাভাবে উত্ত্যক্ত করে মজা দেখে যেন। বেশ কিছুদিন পরে এক পরিব্রাজক সন্ন্যাসী এসে উপস্থিত হন দশাশ্বমেধ ঘাটে। তিনি এই ঘাটেই তার ডেরা ডান্ডা রেখে এখানেই থাকলেন দুটো দিন, বিষ্ণুদাস দেখল এই দুদিন সেই পাগলী ওই সন্ন্যাসীকে গভীর ভাবে লক্ষ্য করছে। আজ তৃতীয় দিন, কাল ওই সন্ন্যাসী চলে যাবেন বলেছেন বিষ্ণুদাসকে। বিষ্ণুদাসকে নিজের জিনিসপত্র দেখতে দিয়ে তিনি এগোলেন গঙ্গার দিকে স্নান করতে, এমন সময় সেই পাগলী এসে তাঁর পথ আটকে দাঁড়ালো। সন্ন্যাসী মৃদু হেসে পাগলীকে কিছু বললেন, বিষ্ণুদাস দেখল পাগলী অপ্রতিভ হয়ে সরে গেল, গঙ্গার কিনারায় ঘটনাটা ঘটল, বিষ্ণুদাস দেখল সব কিন্তু সন্ন্যাসী কি বলল এতো দূর থেকে বুঝতে পারল না।

BANGLADARSHAN.COM

এদিকে সেদিনও বিষ্ণুদাসের “ভাঁড়ে মা ভবানী” দশা, তার ঘরে কিচ্ছুটি নেই। সন্ন্যাসী স্নান করে এসে বিষ্ণুদাসের দোকানের পাশের সিঁড়িতে বসে জপে মন দিলেন। তাঁর জপ শেষ হতেই বিষ্ণুদাস দেখল যে পাগলী এসে হাজির। আজও পাগলী ঝোলা থেকে বের করে দুজনকেই খাবার দিল। সন্ন্যাসী হাত পেতে খাবার নিয়ে পাগলীর দিকে চেয়ে কিছু যেন ইশারা করলেন, পাগলীর চোখে যেন কৌতুক খেলে গেল, কিন্তু সে আজ খাবার দিয়েই চলে গেল না, সে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল তাদের দুজনের ভোজন সমাধা হওয়া পর্যন্ত। বিষ্ণুদাস খেয়ে নিয়ে হাত ধোবার জন্য উঠেছে, এমন সময় পাগলী হঠাৎ এগিয়ে এসে বিষ্ণুদাসের দুই ভ্রূর মাঝখানে হাত দিয়ে ছুঁয়ে দিল।

মুহূর্তে বিষ্ণুদাসের চোখের সামনে মনে হল একটা বিদ্যুতের ঝলকের আলো ছড়িয়ে পড়ল, চোখের ওপর থেকে একটা পর্দা যেন অপসারিত হল। বিষ্ণুদাস কেমন একটা ঘোরের মধ্যে চলে যেতে যেতে দেখল যে সে সন্ন্যাসীর বেশে বসে আছে এই দশাশ্বমেধ ঘাটে ভক্ত শিষ্য পরিবৃত হয়ে, অগণিত ধনী, দরিদ্র, অনাথ আঁতুরের সে আশ্রয় স্থল। উচ্চকোটির আপ্তকাম মহাত্মা সে, কত শত ধন সম্পদ তার ভক্ত শিষ্যেরা তাকে দিয়ে যায়

তার কৃপার পরশ পেয়ে, সে ছোট্ট একটা কুটিয়াতে ঈশ্বর চিন্তায় চরম নির্লিপ্ত নিয়ে দিন কাটায়। একবার তার এক শিষ্য তাকে হিরে বসানো সুন্দর একজোড়া নাগরা জুতো দিল উপহার স্বরূপ। অতো দামী নাগরা জুতো সন্ন্যাসী আর কি করবে, সেটা ঘরের চালের বাঁশের মধ্যে গুঁজে রেখে দিল। এর কিছুদিনের মধ্যেই সে ঠিক করল সে দেহ ছাড়বে, সেই মতো মনোস্কামনা নিয়ে দেহ ছাড়ার ঠিক আগের মুহূর্তে তার চোখে পড়ল সেই নাগরা জুতো জোড়ার ওপরে, সে ভাবতে ভাবতে দেহ ছাড়ল যে অতো দামী নাগরা জুতো আর তার পরা হল না।

মৃত্যুর সময়ে এই বাসনা তার মনে আসাতে তার জন্ম হল চর্মকারের ঘরে এবং তার পূর্ব সংস্কার বিস্মৃত হয়ে মা মহামায়ার মায়ার বেশে সে এতদিন জীবন কাটাল চর্মকারের। তার জ্ঞান চক্ষু উন্মীলন করে যিনি দিলেন সেই পাগলী স্বরূপতঃ মা অন্নপূর্ণা আর সন্ন্যাসী প্রশ্নোপনিষদের প্রবক্তা ঋষি পিপ্পলাদের সত্ত্বা স্বামী পরমানন্দ। স্বামী পরমানন্দ পাগলীকে প্রথম দর্শনেই মা অন্নপূর্ণা বলতে চিনতে পারেন আর এই চর্মকার যে সেই মহাত্মা ছিলেন সেটাও জানতে পারেন কারণ স্বামী পরমানন্দজী নিজেও একজন জীবন্মুক্ত আপ্তকাম মহাত্মা। তিনি গঙ্গায় স্নান করতে যাবার সময়ে মায়ের কাছে অনুরোধ করেন এই চর্মকার বিষ্ণুদাসকে তার স্বরূপ দর্শন করিয়ে এই আবর্ত থেকে মুক্তি দিয়ে আবার সাধনার পথে নিয়ে যেতে আর তাঁর সেই অনুরোধের ফলস্বরূপ বিষ্ণুদাস জানতে পারে আসল পরিচয়। এরপরে সেদিনই সে মা অন্নপূর্ণা আর বাবা বিশ্বনাথকে প্রণাম জানিয়ে স্বামী পরমানন্দজীর সাথে পা বাড়ায় হিমালয়ের নির্জন কন্দরের দিকে যেখানে সে তার সাধনা সমাপ্ত করে ব্রহ্মলীন হবে।

BANGLADARSHAN.COM

তথ্যসূত্র: পরমানন্দম

॥যোগশাস্ত্র প্রণেতা॥

কথায় বলে, "গুরু ঘাঁটিয়ে বিদ্যে পায়, আর রাখাল ঘাঁটিয়ে টাকর (গালাগালি) পায়।" পরমাত্মার সঙ্গে আত্মার সংযোগ এই দেহভান্ডটির মাধ্যমে যে উপায়ে সম্ভব, তার অন্যতম পন্থা যোগশাস্ত্র। ঈশ্বরকৃপা, আত্মকৃপার পরে গুরুকৃপায় মানুষ লৌকিক জীবন থেকে মহাজীবনে উন্নীত হতে পারে সেই গুরুকৃপার সঙ্গে যৌগিক শাস্ত্র করায়ত্ত করতে পারলে। ভারতীয় যোগশাস্ত্রের ইতিহাসে অমলিন অবদান রেখে যাওয়ার জন্য আমরা ঋণী যাঁর কাছে তিনি মহর্ষি পতঞ্জলি, যাঁর সম্পর্কে আমাদের ভারতবাসী হিসেবে জানা আবশ্যক।

খৃষ্টপূর্ব ৭ম শতকে শিক্ষাক্ষেত্রে তক্ষশীলা খুব প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। খৃষ্টপূর্ব ৭০০ শতক থেকে ৫০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তক্ষশীলার ছিল এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। ব্রহ্মদত্ত, কৌটিল্য, পাণিনি, যিবেক ও পতঞ্জলি'র মত মহান পণ্ডিতগণ তক্ষশীলায় অধ্যয়ন করতেন। এদের মধ্যে পতঞ্জলি ছিলেন ভারতীয় যোগ দর্শনের প্রবর্তক, মহান দার্শনিক, ব্যাকরণবিদ ও বিজ্ঞানী। তিনি ছিলেন 'যোগশাস্ত্রে'র স্রষ্টা। হিন্দু যোগ দর্শনের গুরুত্বপূর্ণ প্রামাণিক শাস্ত্রগ্রন্থ 'যোগসূত্র'র সংকলক ছিলেন পতঞ্জলি। মহাভাষ্য (পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী-এর উপর রচিত কাত্যায়নের বৃত্তিকার টীকা) গ্রন্থেরও রচয়িতাও তিনি। দ্বাদশ শতাব্দীতে বিজয় নগরের রাজা বীরবাক্কুর প্রধানমন্ত্রীও ছিলেন এই পতঞ্জলি। তাঁর রচিত গ্রন্থের নাম 'মাধব নিদান।' রোগ নির্ণয়ের জন্য এই গ্রন্থটি গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়েছে।

BANGLADARSHAN.COM

বহু দিন আগে, এক সময় সমস্ত মুনি ও ঋষিরা ভগবান বিষ্ণুর কাছে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন এই কথা বলার জন্য যে, যদিও তিনি (ধন্বন্তরী অবতার) আয়ুর্বেদের মাধ্যমে অসুখ নিরাময়ের উপায় দিয়েছেন, তবুও মানুষ অসুস্থ হয়। তাঁরা এও জানতে চেয়েছিলেন যে যখন মানুষ অসুস্থ হয় তখন কি করা উচিত।

শুধু শারীরিক অসুস্থতাই নয়, কখনও কখনও ক্রোধ, লালসা, লোভ, ঈর্ষা ইত্যাদি থেকে উৎপন্ন মানসিক আবেগজনিত অসুস্থতাও নিরাময়ের প্রয়োজন হয়। এই সব অশুদ্ধি থেকে একজন কিভাবে মুক্তি পেতে পারে? এর উপায় কি?
ঋষিরা যখন তাঁর কাছে নিজেদের বক্তব্য পেশ করলেন, তিনি আদিশেষ/শেষনাগ/অনঙ্গদেবকে (সচেতনতার প্রতীক), তাঁদের কাছে পাঠালেন, যিনি পৃথিবীতে মহর্ষি পতঞ্জলি হয়ে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। এযুগে মহাত্মা রামঠাকুরের গুরু ছিলেন অনঙ্গদেব এবং রামঠাকুর স্বয়ং ছিলেন সেই গুরুর আরেকটি সত্তা।

যোগ দর্শনের প্রবর্তক পতঞ্জলির প্রদর্শিত মার্গ 'পাতঞ্জল দর্শন' নামে পরিচিত। পতঞ্জলির যোগশাস্ত্রের চারটি পাদ। প্রথম পাদে আলোচিত হয়েছে যোগের লক্ষণ ও সমাধি। দ্বিতীয় পাদে সমাধি লাভের পূর্বে অনুসরণীয় ব্যবহারিক যোগ এবং যম, নিয়ম, আসন ইত্যাদি যোগাঙ্গের কথা বা অষ্টাঙ্গ যোগের কথা আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় পাদে ধারণা, ধ্যান, সমাধি ও এসবের ফল এবং বিভূতি বা ঐশ্বর্য আলোচিত হয়েছে। চতুর্থ

পাদে পাঁচ প্রকার সিদ্ধি ও পরা প্রয়োজন কৈবল্যের আলোচনা করা হয়েছে। এইভাবে পতঞ্জলি পৃথিবীতে আসেন যোগের জ্ঞান দান করার জন্য। এই জ্ঞানই 'যোগসূত্র' নামে পরিচিত।

জানা যায়, পতঞ্জলি বলেন ১০০০ মানুষ একত্রিত না হলে তিনি 'যোগসূত্র' আলোচনা করবেন না। সুতরাং সহস্র মানুষ তাঁর জ্ঞান শোনার জন্য বিন্ধ্য পর্বতমালার দক্ষিণ দিকে একত্রিত হলেন। পতঞ্জলির আরেকটি শর্ত ছিল, তাঁর ছাত্রদের ও তাঁর মধ্যে একটি পর্দা রাখতে হবে। ছাত্রদের কেউ সেই পর্দা তুলতে পারবে না। তিনি যতক্ষণ না জ্ঞান দান শেষ করছেন, সবাইকে কক্ষে উপস্থিত থাকতে হবে।

পতঞ্জলি পর্দার আড়ালে থেকে ১০০০ মানুষকে জ্ঞান দান করছেন, প্রত্যেকের মধ্যে সেই জ্ঞান সঞ্চারিত হচ্ছে!

এ এক বিস্ময়কর তত্ত্ব, এমন কি ছাত্ররাও বিশ্বাস করতে পারছিল না কি করে তাদের এই জ্ঞান লাভ হচ্ছে। কি করে গুরু পর্দার আড়ালে থেকে একটি শব্দ উচ্চারণ না করে প্রত্যেকের মাঝে এই জ্ঞানের উপলব্ধি ঘটাচ্ছেন তা তাদের বিশ্বাস হচ্ছিল না।

প্রত্যেকে বিস্ময়ে বিহ্বল অবস্থায় এক অদ্ভুত অনুভব প্রাপ্ত হল। প্রত্যেকে এমন এক অদম্য শক্তি, এমন এক অভাবনীয় উৎসাহ অনুভব করছিল যে তারা স্থিরভাবে তা ধারণ করত পারছিল না। কিন্তু তাদেরকে নিয়ম বজায় রাখতে হবে।

BANGLADARSHAN.COM

একটি ছোট ছেলেকে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে হয়েছিল। তাই সে স্থান ছেড়ে চলে যায়। সে মনে মনে ভাবল যে, সে যাবে এবং নিঃশব্দে ফিরে আসবে। আরেক জন কৌতুলী হয়ে উঠল–"পর্দার আড়ালে গুরুদেব কি করছেন? আমি দেখতে চাই।"

এখানে গুরু যে চোখের সামনে না থেকেও তাঁর জ্ঞান শিষ্যদের মধ্যে সঞ্চার করেছিলেন, তা তিনি প্রত্যেকের আত্মার সঙ্গে নিজ আত্মার আত্মিক সংযোগ ঘটিয়েছিলেন। আর মাঝখানের পর্দাটি হল অজ্ঞতার পর্দা। ঘরের মধ্যে উপস্থিতি মানে আত্মার সঙ্গে আত্মার সংযোগ রক্ষা করা।

একটি ছাত্র আর ধৈর্য রাখতে না পেরে পর্দাটি তুলে দেয়, সঙ্গে সঙ্গে সেই ছাত্রটিসহ বাকি ৯৯৮ জন ছাত্র ভস্ম হয়ে যায়, মহর্ষি পতঞ্জলি খুবই দুঃখিত হন, যেখানে তিনি সারা বিশ্বকে জ্ঞান দানে রাজি ছিলেন, সেখানে তাঁর সমস্ত ছাত্র ভস্মীভূত হয়ে গেল। আধার উপযুক্ত হবার আগে যদি জ্ঞান ও সাধনা বেশী হয়ে যায়, তবে আধারের দেহ নাশ হয়।

এমন সময় সেই ছোট ছেলেটা ফিরে এল, মহর্ষি তাকে জিজ্ঞেস করলেন সে কোথায় গেছিল। ছোট ছেলেটি তাঁকে বলল যে সে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে বাইরে গেছিল এবং তার এই না অনুমতি নিয়ে বেরোনোর জন্য মহর্ষি যেন তাকে ক্ষমা করে দেন। মহর্ষি স্বস্তির সঙ্গে ভাবলেন যে একজন অন্তত রয়েছেন যাকে তিনি যোগের সূত্রগুলোর বিষয়ে তাঁর জ্ঞান দান করতে পারবেন, তিনি সেই ছেলেটিকে সমস্ত জ্ঞান দান করলেন। কিন্তু

জ্ঞানলাভের শেষে ছেলেটিকে বললেন যে যেহেতু সে আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার সংযোগের পদ্ধতির জ্ঞান লাভ করার সময়ে গুরুর অনবধানে বারণ সত্ত্বেও কক্ষ ত্যাগ করেছে, তাই সে নিয়ম ভেঙেছে, ফলে সে ব্রহ্মরাক্ষস হয়ে গাছে ঝুলে থাকবে আর এই অভিশাপ থেকে সে তখনি মুক্তি পাবে যখন সে এই জ্ঞান একজন শিষ্যের মধ্যে সম্যক ভাবে প্রদানে সমর্থ হবে। এই বলে পতঞ্জলি দেব অদৃশ্য হলেন।

ব্রহ্মরাক্ষস গাছে ঝুলে রইল, যে গাছের তলা দিয়ে যায়, তাকে সে একটা করে প্রশ্ন করে, তারা উত্তর দিতে অপারগ হয় আর সে তাদের খেয়ে ফেলে, এছাড়া তার আর কোনো রাস্তা নেই, এইভাবে তার কয়েক হাজার বছর কেটে গেল। সে এই সময়ের মধ্যে একজনকেও পেল না যাকে সে যোগসূত্রের জ্ঞান দান করতে পারে। একজন জ্ঞানী ব্যক্তি যখন বিপথগামী হন, তখন সে একজন সাধারণ দুষ্কৃতির চেয়ে অনেক বেশী ভয়ঙ্কর হন। এইভাবে ব্রহ্মরাক্ষস গাছে ঝুলে থেকে মুক্তির প্রতীক্ষা করতে রইল।

দয়াপরবশ হয়ে শেষে মহর্ষি পতঞ্জলি আবার নিজেই জন্ম নিয়ে এলেন তার কাছে শিষ্য হয়ে এবং ব্রহ্মরাক্ষস তাঁকে যোগসূত্রের পূর্ণজ্ঞান দান করলেন। শিষ্যরূপী পতঞ্জলি তা কয়েকটি তালপাতায় লিখে রাখলেন। শিষ্যকে মুক্তি দিতে গুরু তাঁর শিষ্যের শিষ্য হলেন। পতঞ্জলি সূত্রগুলি গাছের মগডালে বসে লেখেন যেহেতু ব্রহ্মরাক্ষস ওখানেই থাকে এবং ওখানে বসেই সূত্রগুলি বিবৃত করে। ব্রহ্মরাক্ষস রাত্রে তাঁকে বলেন আর পতঞ্জলি তা পাতায় লেখেন। প্রতিদিন তিনি কিছু পাতা তুলে আনেন, দেহের কোন জায়গায় কেটে রক্ত বের করে তাই দিয়ে লিখে রাখেন। এইভাবে সাতদিন ধরে লিখে সমস্ত জ্ঞান আহরণ করে তিনি ক্লান্ত হয়ে গেলেন। সব লেখা শেষ হলে তিনি সব পাতাগুলোকে একটুকরো কাপড়ে বেঁধে গাছের তলায় রেখে নদীতে গেলেন স্নান করতে। যখন তিনি ফিরে এলেন, দেখলেন যে একটা ছাগল ওই পাতাগুলোর বেশিরভাগটাই খেয়ে ফেলেছে। ছাগলটি এখানে মায়ার প্রতীক যার বশে আমাদের জ্ঞানের দীপ্তি অনেকটাই ঢেকে যায়। উপযুক্ত স্থান, কাল ও পাত্র বিবেচনা না করে জ্ঞান অরক্ষিত রাখা অনুচিত। পতঞ্জলি কাপড়ের ঝোলাটির মধ্যে বেঁচে যাওয়া পাতাগুলি নিলেন এবং ওখান থেকে চলে গেলেন। এখানে এই পাতাগুলি জ্ঞানের প্রতীক যে জ্ঞান একসঙ্গে পুরোটা ধারণ করা কারুর পক্ষে সম্ভব নয়। গল্পটি পুরাণের, গল্পটির অন্তর্নিহিত গভীরতা আছে যা পুরাণ ব্যাখ্যা করে না, পাঠকের চিন্তা শক্তির ওপরে ছেড়ে দেয় তার রহস্য উদ্ধার করতে।

BANGLADARSHAN.COM

পতঞ্জলির সংজ্ঞানুসারে ‘যোগ’ মানে হল মনের পরিবর্তনকে নিয়ন্ত্রণ করা। বিভিন্ন ধরণের যোগ থাকলেও, প্রত্যেক ধরণের যোগের উদ্দেশ্যই হল মনকে নিয়ন্ত্রণ বা বশ করা। ‘যোগ’ শব্দটি এসেছে সংস্কৃত শব্দ ‘ইউয্’ থেকে। যার মানে হল একত্রিত করা–আত্মার সাথে পরমাত্মার সংযোগ। পতঞ্জলি যোগ দর্শনকে বাংলায় ব্যাখ্যা করেছেন অনেকেই, কিন্তু প্রাঞ্জল সাবলীলভাবে যৌগিক ব্যাখ্যা করেছেন ব্রহ্মর্ষি সত্যদেব এবং শ্রীমৎ হরিহরানন্দ গিরি। এঁদের দুজনেরই ব্যাখ্যা সাধারণের পক্ষে বোঝা সম্ভব যদিও মূল বিষয়টি গুরুকৃপাতেই বোধের স্তরে আসে। কারণে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ও মনকে সংযত করে অতীন্দ্রিয় স্তরে উন্নীত হতে হয় আর সেই অতীন্দ্রিয় অনুভব গুরুকৃপা ভিন্ন অধরাই থেকে যায়, কারণ সদ্গুরু আসেন সাধারণকে উদ্ধার

কল্পে সাধনা করিয়ে নিয়ে মোক্ষ প্রদান কার্যে, যাঁকে ঈশ্বর স্বয়ং চাপরাশ দিয়ে প্রেরণ করেন। তাই সর্ব স্তরেই "গুরু কৃপাহি কেবলম"।

"গুরু পরম ধন অমূল্য রতন
রাখরে হৃদয়ে ধরি করি সযতন।"–শ্রীশ্রী মা সর্বাণী

BANGLADARSHAN.COM

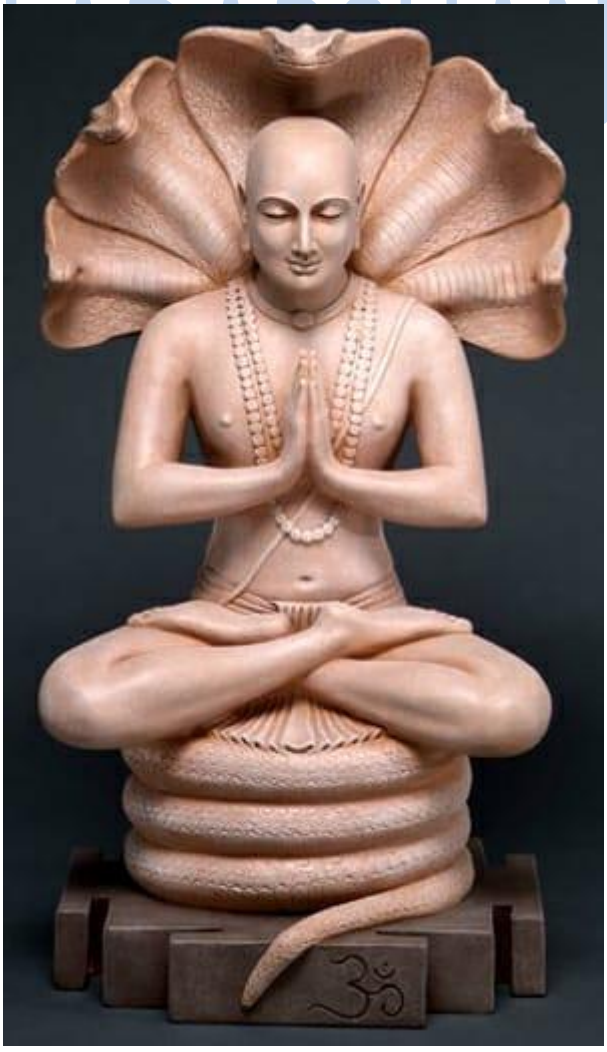

॥বহুরূপে ঈশ্বর॥

তিব্বতের প্রত্যন্ত অঞ্চল ছেড়ে মধ্য রাত্রির অন্ধকার ভেদ করে ছুটে চলেছেন সন্ন্যাসী। স্বয়ং মা তারা দর্শন দিয়ে ভর্ৎসনা করে তাঁকে অবিলম্বে চলে যেতে বলেছেন তিব্বত, যা সেই সময় মহাচীন বলে খ্যাত ছিল, সেই অঞ্চল ছেড়ে পরেরদিন ঊষার উন্মেষ হবার আগে। কে এই তরুণ সন্ন্যাসী, যাঁর প্রজ্ঞা আর জ্ঞান পবিত্রতার দীপ্তিতে হিন্দু ধর্ম সতত সমুজ্জ্বল রূপ পেয়েছে, যা একদা বৌদ্ধ ধর্মের প্রচারে ও প্রসারে লুপ্ত হতে বসেছিল? যাঁর হাত ধরে আর্যাবর্তের চারটি দিকে স্থাপিত হয়েছিল চারটি অদ্বৈত বৈদান্তিক মঠ এবং সন্ন্যাসীদের দশনামী সম্প্রদায়, সেই অদ্বৈত বেদান্তের প্রবক্তা আদি শঙ্করাচার্য। সেই সন্ন্যাসী আদি শঙ্করাচার্য যাঁর প্রতি মা তারার এই অদ্ভুত আদেশ, কিন্তু কেন এমন আদেশ দিলেন সর্বসিদ্ধিপ্রদায়িনী মা তারা? মা তারা তো ভক্তবৎসল, তনয়ের ইষ্টফলদাত্রী, তাহলে এমন আদেশ হল কেন? তাও আবার আদি শঙ্করাচার্যের মত শিবাবতারকে যিনি গোটা আর্যাবর্তকে তাঁর অদ্বৈত বেদান্ত দর্শনের মাধ্যমে হিন্দু ধর্মকে পুনরুত্থাপিত করে আসমুদ্রহিমাচল একই সূত্রে গেঁথেছিলেন?

গৌড়পাদ ছিলেন আদি শঙ্করের গুরু গোবিন্দ ভাগবতপাদের গুরু। আদি শঙ্কর নিজেই এই তথ্যটি স্বীকার করেছেন এবং গৌড়পাদ যে তার গুরুর গুরু ছিলেন, সেই ব্যাপারে নানা উদ্ধৃতির উল্লেখ করেছেন তাঁর বিবেকচূড়ামনি রচনার প্রারম্ভে। আদি শঙ্কর অষ্টম শতাব্দীর ব্যক্তিত্ব হলে তাই অনুমিত হয় গৌড়পাদ খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাঁর বাড়ি ছিল গৌড়দেশে, এই অনুমানে কোন সংশয় নাই।

BANGLADARSHAN.COM

গোবিন্দ ভাগবতপাদ ছিলেন অদ্বৈত বেদান্ত দর্শনের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রবক্তা, অদ্বৈত বেদান্ত দর্শন সনাতন হিন্দু ধর্মের বহু প্রাচীন মতবাদ যেটি মহর্ষি ব্যাসদেব (গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলেছেন যে মহাত্মাদের বা ঋষিদের মধ্যে তিনি ব্যাসদেব) তাঁর ব্রহ্মসূত্রের মাধ্যমে একেশ্বরবাদ দর্শনটি প্রতিষ্ঠা করেন। এই মতবাদটি গৌড়পাদ লাভ করেন তস্যগুরু ব্যাসপুত্র শুকদেবের কাছ থেকে এবং প্রদান করেন তদীয় শিষ্য গোবিন্দপাদকে। গোবিন্দপাদ ব্যাসদেবকে অনুরোধ করেন ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যাটি প্রদান করে লিপিবদ্ধ করতে, নাহলে সাধারণ মানুষ যাঁর যাঁর মতানুযায়ী তা ব্যাখ্যা করবে যে। যাঁর উত্তরে ব্যাসদেব জানান “কিছু সময়ের মধ্যেই একজন শিষ্য আসবে গোবিন্দপাদের কাছে যে প্রজ্ঞা ও জ্ঞানে তাঁর (ব্যাসদেবের) সমতুল্য হবে এবং সে এসে এই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা করবে। সে সমগ্র নর্মদার জলধারা তাঁর কমণ্ডলুতে ভরে ফেলবে যে ঘটনাটি দিয়ে গোবিন্দপাদ তাঁকে চিনতে পারবেন।” গোবিন্দপাদ সেই থেকে ধ্যানমগ্ন হয়ে ওঙ্কারেশ্বরে অপেক্ষা করতে থাকেন।

“অদ্বৈত গুরু-পরম্পরা”

ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনে, সকল জ্ঞানের উৎস ঈশ্বর এবং ঈশ্বরের থেকে বেদদ্রষ্টা ঋষিরা সেই দর্শন প্রাপ্ত হয়েছেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

“গুরু-পরম্পরা”

শাস্ত্র অনুসারে, অদ্বৈত গুরু-পরম্পরার উৎস পৌরাণিক যুগের “দৈব-পরম্পরা।” তারপর এই দর্শনে বেদজ্ঞ “ঋষি-পরম্পরা” শুরু হয় এবং শেষে “মানব-পরম্পরা” বা ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বদের গুরু পরম্পরায় উপনীত হয়।

দৈব-পরম্পরা: নারায়ণ, পদ্মভুব (ব্রহ্মা)।

ঋষি-পরম্পরা: বশিষ্ঠ, শক্তি, পরাশর, ব্যাস, শুকদেব।

মানব-সম্প্রদায়: ঈশ্বরকৃষ্ণ আচার্য, গৌড়পাদ, গোবিন্দ ভাগবতপাদ, আদি শঙ্কর।

যুগ (হিন্দুধর্ম)

শাস্ত্র অনুসারে, প্রত্যেক যুগের নিজস্ব গুরু আছেন:

সত্যযুগে: নারায়ণ, সদাশিব, ব্রহ্মা

ত্রেতাযুগে: বশিষ্ঠ, শক্তি ও পরাশর

দ্বাপরযুগে: ব্যাস ও শুক

কলিযুগে: ঈশ্বরকৃষ্ণ আচার্য, গৌড়পাদ, গোবিন্দ ভাগবদপাদ ও আদি শঙ্কর ও তার শিষ্যরা।

BANGLADARSHAN.COM

আদি শঙ্করাচার্যের জন্ম কেরলের কালাডি গ্রামে, দাক্ষিণাত্যের প্রখ্যাত সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণ বংশে। তাঁর বাবার নাম ছিল শিবগুরু ও মায়ের নাম আর্যাম্বা। অবিচল শিবভক্ত পিতামাতার বেশী বয়সের সন্তান তিনি, ত্রিশূরের বৃষভচল শিবমন্দিরে পুজো দিলে তাঁদের অটল ভক্তিতে তুষ্ট মহাদেব যখন বর প্রার্থনা করতে বলেছিলেন শঙ্করের পিতামাতাকে তাঁদের জিজ্ঞেস করেছিলেন কি রকম সন্তান তাঁরা চান, বুদ্ধিমান স্বল্পায়ু না মূর্খ দীর্ঘায়ু? পিতামাতা বুদ্ধিমান স্বল্পায়ু সন্তান কামনা করেন এবং তাঁরা সন্তান রূপে লাভ করেন শঙ্করকে। মাত্র আটবছর বয়সে শঙ্করের চারটি বেদ কণ্ঠস্থ ছিল। উপনয়নের আগে তাঁর পিতৃবিয়োগ হয়, তাঁর মা তাঁর উপনয়নের ব্যবস্থা করে উপনয়ন যখন দেন শঙ্কর মায়ের কাছে সন্ন্যাসের জন্য অনুমতি চান, কিন্তু মা অনুমতি দিতে নারাজ। মায়ের সঙ্গে একদিন গেছে গ্রাম সংলগ্ন পূর্ণা নদীতে স্নান করতে, হঠাৎ কুমিরে তাঁর পা টেনে নিয়ে চলল, শঙ্কর চেঁচিয়ে মাকে বলল, “হয় তুমি আমায় সন্ন্যাসের অনুমতি দাও নচেৎ কুমির আমার প্রাণ নাশ করবে।” মা বাধ্য হয়ে অনুমতি দিলেন, কুমির সঙ্গে সঙ্গে শঙ্করের পা ছেড়ে দিল। শঙ্কর অঙ্গীকার করল মায়ের কাছে সে মায়ের অন্তিম সময় ঠিক উপস্থিত হবে এবং মায়ের অন্তিম সংস্কার আর পারলৌকিক কাজ করবে।

শঙ্কর কেরল ত্যাগ করে গুরুর খোঁজে উত্তর ভারতের দিকে রওনা হলেন। সুদূর কেরল থেকে শঙ্কর গিয়ে উপস্থিত হলেন নর্মদা তটে। নর্মদা নদীর তীরে ওঙ্কারেশ্বরে তিনি গৌড়পাদের শিষ্য গোবিন্দ ভগবদপাদের দেখা পান। গোবিন্দ শঙ্করের পরিচয় জানতে চাইলে, শঙ্কর মুখে মুখে "নির্বাণাষ্টাকম" শ্লোকটি রচনা করেন। এই শ্লোকটিই অদ্বৈত বেদান্ত তত্ত্ব প্রকাশ করে। গোবিন্দ তা শুনে খুব খুশি হন এবং শঙ্করকে শিষ্য হিসেবে গ্রহণ করেন।

নির্বাণাষ্টাকম শ্লোকের প্রথম স্তবক
শিবোহং শিবোহং, শিবোহং শিবোহং, শিবোহং শিবোহং

মনো বুধ্যহংকার চিত্তানি নাহং
ন চ শ্রোত্র জিহ্বা ন চ ঘ্রাণনেত্রম।
ন চ ব্যোম-ভূমির-ন তেজো ন বায়ুঃ
চিদানন্দ রূপঃ শিবোহং শিবোহম॥

অর্থ—আমি মন-বুদ্ধি-অহংকার-চিত্ত নই, আমি শোত্র-জিহ্বা-ঘ্রাণ-নেত্র অর্থাৎ পঞ্চেন্দ্রিয় নই, আমি আকাশ-ভূমি-তেজ-বায়ু অর্থাৎ পঞ্চভূত নই, আমি সচ্চিদানন্দময় শিবস্বরূপ আত্মা।

BANGLADARSHAN.COM

শঙ্করকে গোবিন্দপাদ হঠযোগ, রাজযোগ ও জ্ঞানযোগের জ্ঞান প্রদান করেন। হঠযোগ ও রাজযোগ প্রাপ্ত হয়ে শঙ্করের অষ্ট সিদ্ধি যথা—অনিমা, লঘিমা, দূরদর্শন, দূর শ্রবণ, ইচ্ছা মৃত্যু প্রভৃতি সিদ্ধি করায়ত্ত করেন। শঙ্করকে সব জ্ঞান দান করে গোবিন্দপাদ গভীর ধ্যানে মগ্ন হন। হঠাৎ নর্মদা তটে শুরু হয় প্রবল বর্ষণ, অতিবৃষ্টির ফলে নর্মদার জল বাড়তে থাকে এবং প্লাবন উপস্থিত হয়। শঙ্কর দেখেন জল প্রায় গুরুর গুহাতে প্রবিষ্ট হয়ে যাবে, তিনি নিজের কমণ্ডলুতে নর্মদার উত্তাল জলধারাকে সুসংহত করেন। গোবিন্দপাদ ধ্যান যোগে বিষয়টি অবগত হন এবং তাঁর ধ্যানভঙ্গ হয়। তিনি শঙ্করকে আশীর্বাদ করে পাঠান সমগ্র আর্যাবর্তে অদ্বৈত বৈদান্তিক সনাতন হিন্দু ধর্মকে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করতে।

গোবিন্দপাদ শঙ্করকে ব্রহ্মসূত্রের একটি ভাষ্য লিখতে এবং অদ্বৈত মত প্রচার করতে বলেন। শঙ্কর কাশীতে আসেন। সেখানে সনন্দন নামে এক যুবকের সঙ্গে তার দেখা হয়ে যায়। এই যুবকটি দক্ষিণ ভারতের চোল রাজ্যের বাসিন্দা ছিল। সে-ই প্রথম শঙ্করের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। কাশীতে বিশ্বনাথ মন্দির দর্শন করতে যাওয়ার সময় এক চণ্ডালের সঙ্গে শঙ্করের দেখা হয়ে যায়। সেই চণ্ডালের সঙ্গে চারটি কুকুর ছিল। শঙ্করের শিষ্যরা চণ্ডালকে পথ ছেড়ে দাঁড়াতে বললে, চণ্ডাল উত্তর দেয়, "আপনি কি চান, আমি আমার আত্মাকে সরাই না এই রক্তমাংসের শরীরটাকে সরাই?" শঙ্কর বুঝতে পারেন যে, এই চণ্ডাল স্বয়ং শিব এবং তার চারটি কুকুর আসলে চার বেদ। শঙ্কর তাঁকে প্রণাম করে পাঁচটি শ্লোকে বন্দনা করেন।

মনীষাপঞ্চকম–

অন্নময়াদন্নময়মথবা চৈতন্যমেব চৈতন্যাত্।
য়তিবর দূরীকর্তুং বাঞ্ছসি কিং ব্রূহি গচ্ছ গচ্ছেতি॥

এই পাঁচটি শ্লোক "মনীষা পঞ্চকম্" নামে পরিচিত।

আদি শঙ্করাচার্য যখন হিন্দু ধর্মের পুনরুত্থানের জন্য আসমুদ্রহিমাচল তর্কযুদ্ধে ও শাস্ত্রবিচারে অন্য ধর্মের মতাবলম্বী পন্ডিতদের হারাতে হারাতে নেপাল ছাড়িয়ে তিব্বতে (তৎকালীন মহাচীন) উপস্থিত হন এবং সেখানকার বৌদ্ধ পন্ডিতদেরও পরাস্ত করেন এবং পরের দিন ধার্য্য হয় তাঁদের বৌদ্ধ ধর্ম ত্যাগ করে হিন্দু ধর্ম গ্রহণের, তখন সেখানকার সেই বজ্রযোগিনী তারার উপাসক পন্ডিতেরা বজ্রযোগিনী মা তারার কাছে আকুল আবেদন করেন যাতে তাঁদের মায়ের উপাসনা ও বৌদ্ধ ধর্ম না ত্যাগ করতে হয়, তাঁরা প্রার্থনা জানান মায়ের কাছে তাঁদের স্বধর্ম রক্ষার। যার ফলশ্রুতি মা তারা রাত্রের দ্বিপ্রহরে আবির্ভূত হয়ে আদি শঙ্করাচার্যকে ভর্ৎসনা করেন এবং সেই রাত্রের মধ্যে ঐ স্থান পরিত্যাগ করার আদেশ দিয়ে বলেন যে মায়ের যে সন্তান মাকে যে রূপে ও উপায়ে চাইবে আরাধনা করবে, আদি শঙ্করকে মা সেই অধিকার দেননি তিনি সকলকে নিজ মত গ্রহণে বাধ্য করেন। শোনা যায়, তারামায়ের কাছে ভর্ৎসিত হয়ে আদি শঙ্করাচার্য মাকে শান্ত করতে "ভবান্যাষ্টকাম" স্তোত্রটি রচনা করে মায়ের স্তব করে মাকে শান্ত করেন, আশীর্বাদ লাভ করেন এবং মায়ের আদেশপ্রাপ্ত আদি শঙ্করাচার্য মায়ের কাছে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়ে সেই রাত্রে সেই স্থান ত্যাগ করে চলে আসেন আর তিব্বত ও তার পার্শ্ববর্তী চীন (যা সেই সময়ে মহাচীন নামে খ্যাত ছিল) ও অন্য উত্তর পূর্বের বেশ কিছু জায়গায় বৌদ্ধ ধর্ম বিদ্যমান থাকে। তাই ভারতের ওই অঞ্চলে ও মহাচীনে আজও মন্দ্রিত হয়, "ওঁম মণিপদ্মে হুম" নাদ আর বৌদ্ধ সাধনার তান্ত্রিক ধারায় মা বজ্রযোগিনী তারার সাধনা আজও নিয়ত বিদ্যমান রয়েছে ঐদিকে।

BANGLADARSHAN.COM

আদি শঙ্করাচার্য

গুরু গোবিন্দপাদ

॥শ্রদ্ধাবানের অনুভবে॥

"হে দেব হে দয়িত হে জগদেকবন্ধো
হে কৃষ্ণ হে চপল হে করুনৈকসিন্ধো
হে নাথ হে রমণ হে নয়নাভিরাম
হা হা কদা নু ভাবিতাসি পদং দৃশোরমে।"

অর্থ–হে দেব, হে কান্ত, হে জগতের একমাত্র বন্ধু, হে কৃষ্ণ, হে চপল, হে করুণার সমুদ্র, হে নাথ, হে রমণ, হে নয়নরঞ্জন, হায় কবে আমার নয়ন গোচর হবে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা যাঁরা পড়েন তারা সকলেই জানেন যে শ্রীশ্রীপরমব্রহ্ম যিনি প্রত্যেক জীবের পরম লক্ষ্য, তাঁকে জানতে হলে যে পথ অবলম্বন করতে হয়, সেটি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন, যেটি সত্যযুগেও বিদ্যমান ছিল। সত্যযুগে হংস ভগবান যখন সনৎকুমারদি ঋষিগণকে ব্রহ্মবিদ্যা প্রদান করে ছিলেন, সেটি গীতারই সাধন ছিল। গীতা হচ্ছে আত্মগীত যার একটি চিন্ময়রূপ বর্তমান। সম্পূর্ণ গীতা তাই দেবতাস্বরূপ, যিনি কোনো কোনো মহাত্মার কাছে প্রকট হয়েছেন ধ্যানজ্যোতিরূপে। গীতার শ্লোকেও বলা আছে যে শুদ্ধাভক্ত যেখানে গীতা পাঠ করেন ও শ্রবণ করেন, ভগবান সেখানে আবির্ভূত হন। গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের ৩৮ নম্বর শ্লোকটিতে আছে:

BANGLADARSHAN.COM

"শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি॥ ৩৯"

অনুবাদ: সংযতেন্দ্রিয় ও তৎপর হয়ে চিন্ময় তত্ত্বজ্ঞানে শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি এই জ্ঞান লাভ করেন। সেই দিব্য জ্ঞান লাভ করে তিনি অচিরেই পরা শান্তি প্রাপ্ত হন।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ক্লাস চলাকালীন একটি ঘটনা শুনেছিলাম, বেশ কিছু বছর আগে এক ব্যক্তি একবার প্রয়াগে কুম্ভমেলায় সপরিবারে স্নানে গেছেন, ব্যক্তিটি একটু অসুস্থই ছিলেন, সঙ্গে স্ত্রী আছেন, জননী আছেন, পুত্র আছেন। সেবারে প্রয়াগে ছিল পূর্ণকুম্ভ মেলা, অস্বাভাবিক ভিড় হয়েছে, ভীষণ কোলাহল। ঠিক স্নান সেরে ফেরবার সময়ে হঠাৎ দশনামী সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীদের মিছিল শুরু হয় ঘোড়া, হাতি, শিঙ্গা নাকাড়া বাজিয়ে এবং সাধারণ পুণ্যার্থীদের মধ্যে প্রচন্ড হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। সেই ব্যক্তিটি তাঁর পরিবারের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান ভীড়ের একটা দিকে আর পরিবার রয়ে যায় আরেকদিকে। ভদ্রলোক ভিড়ের ধাক্কায় উপুড় হয়ে পড়ে যান এবং তাঁর ওপর দিয়ে লোক দৌড়োতে থাকে তাঁকে পদপিষ্ঠ করে। ভদ্রলোক একে অসুস্থ ছিলেন, তারওপর এই ভিড়ের চাপ এবং অসংখ্য মানুষের পায়ের তলায় পিষ্ট হবার যন্ত্রণায় জ্ঞান হারিয়ে পড়ে থাকেন। এদিকে পরিবারের লোকজন তাঁকে খুঁজতে থাকে, ভীড় কমলে আর সন্ন্যাসীদের মিছিল চলে গেলে প্রথমে তাঁর স্ত্রী ও পরে পুত্র দেখেন তিনি ঐভাবে বাহ্যজ্ঞানরহিত অবস্থায় উপুড় হয়ে পড়ে আছেন, তৎক্ষণাৎ সেখানকার

স্বেচ্ছাসেবীদের সাহায্যে তাঁকে ধরাধরি করে তুলে তাঁর পরিবার তাঁদের তাঁবুতে নিয়ে আসেন। ভদ্রলোকের জ্ঞান ফেরার পরে একটু সুস্থ হলে তিনি বেশ কিছুক্ষন ধরে সংস্কৃতশ্লোক বলতে থাকেন, একটু ধাতস্থ হবার পরে তাঁর স্ত্রী জানতে চান তিনি হঠাৎ সংস্কৃত শ্লোক বলছিলেন কেন, তাঁর স্ত্রী যারপরনাই আশ্চর্য হয়েছিলেন কারণ সেই ভদ্রলোক যে আদৌ সংস্কৃত জানেন তা তাঁর স্ত্রীর অজ্ঞাত। তখন ভদ্রলোক বলেন যে ছোটবেলায় আট বছর বয়স থেকে তিনি টানা ছবছর প্রত্যেকদিন সংস্কৃত মন্ডিতমশাইয়ের কাছে গীতা পাঠ করতেন, এবং পরেরদিন সেটার পড়া দিতে হতো পন্ডিতমশাইকে, ফলে গীতা তাঁর মননে গেঁথে ছিল, কিন্তু তারপরে বহুদিন তাঁর নানাবিধ কারণে গীতাপাঠে ছেদ পড়ে যায়। যখন ঐ ভীড়ের চাপে তিনি জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেছিলেন, তখন তিনি দেখেছেন তিনি একটি নদীর বালুকাময় তটে একাকী দাঁড়িয়ে রয়েছেন আর বেশ কিছু গাছের পাতা উড়ে উড়ে তাঁর চারিদিকে যেন ঘুরছে, তিনি আস্তে আস্তে একটি দুটি পাতা হাত দিয়ে ধরেন, ধরে দেখেন সেগুলির প্রতিটিতেই একটি করে গীতার শ্লোক লেখা রয়েছে, সেগুলি তিনি একটি করে ধরতে থাকেন আর বলতে থাকেন, বেশ কিছুক্ষন এইভাবে করার পরে তিনি অনুভব করেন তাঁর জ্ঞান ফিরে এসেছে এবং তিনি পরিবারের মধ্যে আবার ফিরে এসেছেন। সেইদিন থেকে ভদ্রলোক আবার গীতাপাঠ শুরু করেন এবং জীবনের শেষে এসে ঈশ্বরকৃপায় মোক্ষলাভ করেন।

ঘটনাটা শুনতে ভালো লেগেছিল, কিন্তু বিশ্বাস যে হয়েছিল বলতে পারি না। এর কিছুদিন পরে আমার গীতার ক্লাসে উপস্থিতির ছেদ পড়ে। আমার পায়ে অস্টিওআর্থিরিটিসের প্রচন্ড ব্যথা বাড়ে, তা ছাড়া আমার যেহেতু চোখ হাই পাওয়ারের চশমা, রোদ্দুরে আমি তাই ভীষণ কাহিল হয়ে যায়, মাথার যন্ত্রণা শুরু হয়ে জ্বর এসে যায়, এদিকে আমাদের গীতার ক্লাস সকালে ছাড়া হয়না। এইসব নানা কারণে আমার গীতার ক্লাসে যাওয়া হয়নি বেশ কিছুদিন। আমি ভেতরে ভেতরে ক্লাস না করতে পারার অপরাধবোধে ভুগতে থাকি। এই সময় পর পর চার পাঁচদিন আমি ঘুমের মধ্যে গীতার শ্লোক শুনতে থাকি এবং সকালে উঠেও দেখি সেগুলো মনে রয়ে গেছে। আমার ক্লাসে শোনা ওপরের ঘটনাটা মনে পড়ে যায় এবং খুব অবাক হই।

BANGLADARSHAN.COM

এর কিছুদিন পরে আমাদের যিনি গীতার শিক্ষক, যিনি নিজেও অতি সাত্বিক ও জ্ঞানী, তাঁর সাথে আমার অন্য জায়গায় দেখা হলে তিনি প্রথমেই অভিযোগ করেন আমার গীতার ক্লাসের অনুপস্থিতি নিয়ে। আমি তখন তাঁকে বলি আমার টানা কয়েকদিন ধরে এই ঘুমের মধ্যে গীতার শ্লোক শোনার ঘটনা, শুনে তিনি আমায় আবার ক্লাসে যোগদান করতে বলে বলেন, “ক্লাসে আপনাদের বলেছিলাম মনে আছে “শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানং”, আপনার ঐ ঘটনায় বিশ্বাস না থাকলেও গীতার ওপরে “পাঁচ শিকে পাঁচ আনা” বিশ্বাস আর ভক্তি তো রয়েছেই, তার ফল আপনি চাইলেও এড়াতে পারবেন কেন? গীতা যে স্বয়ং ভগবান উবাচ।” আমি স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম তাঁর কথায়, ক্লাসে জয়েনও করেছিলাম এবং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রতি আরো বেশী শ্রদ্ধাশীল হয়ে গেছি। এখন একদম শেষের অষ্টাদশ অধ্যায়ের মাঝে আমাদের করোনার জন্য ক্লাসে ছেদ পড়েছে কিন্তু এখনো ওই ঘুমের মধ্যে গীতার শ্লোক শোনার ঘটনা ভাবলে মনে পড়ে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের সেই অমরপদটি,

“আজো সেথা লীলা করেন গোরা রায়,
কোনো কোনো ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়।”

BANGLADARSHAN.COM

॥দিব্যত্রয়ীর সঙ্গে সংযোগ॥

বিয়ের পরে বরের বইয়ের তাক গোছাতে গিয়ে একটা বই হাতে পেলাম যার সামনের বেশ কিছু পাতা আর পেছনের বেশ কিছু পাতা নেই, ওর পৈতেতে পাওয়া বই ছিল সেটা। মাঝখানের পাতাগুলো পড়ার সময় জানলাম ওই বইটা সাহিত্যিক শ্রীঅতিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের লেখা, "পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ", বইটি বেশ কয়েকবার পড়ে প্রথম থেকে পড়ার আগ্রহ বেড়ে গেল। যিনি আমাদের কাগজ দেন, তিনি বইপত্র দরকার মতো এনে দিতেন, তাঁকে বললাম ঐ বইটি যদি এনে দেন, তিনি বললেন যে বইটির তিনটি খণ্ড, আমার কোন খণ্ডটি প্রয়োজন? বললাম, "প্রথম খণ্ডটি আগে এনে দিন।" তিনি এনে দেবেন বললেন, কয়েকদিন পরে ফোন করে বললেন যে বইটির অখণ্ড সংকলন বেরিয়েছে, একটু বেশী দাম, আমি নেব কিনা। আমি এনে দিতে বললাম। বইটা এল, আমি বার চারেক পড়ে আমার কর্তাকে জোর করে পড়ালাম, কারণ সে অফিস আর বাজনার বাইরে সময় দিতে নারাজ, তবু পড়ল এবং আমার মতই উচ্ছসিত হল। জনৈক কবি শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত সম্পর্কে ঠিকই বলেছিলেন, "ঠাকুর তোমাকে কে চিনতো, যদি না চেনাতো অচিন্ত্য?" এরপরে পড়লাম ঐ লেখকেরই "পরমা প্রকৃতি শ্রীশ্রী মাসারদা", শ্রীম কথিত "রামকৃষ্ণ কথামৃত" পড়লাম, শ্রীসারদানন্দজীর লেখা "শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গে" পড়লাম। জানলাম এবং উপলব্ধি করলাম যে মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর দর্শন আর সারা জীবন মানুষকে সেই দর্শনের জন্য প্রয়াস বা সাধনা চালিয়ে যেতে হয়। এই বইটা আমার এবং আমার পরিবারের জীবনের গতিপথটা নির্ণয় করে দিল। আমার মাকে একরকম জোর করে "পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ" পড়াই আমি।

BANGLADARSHAN.COM

"পরম পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ-এর অংশ বিশেষ দিলাম একটুখানি গঙ্গাজলে পূজা করতে।

#রামকৃষ্ণ-ঋষিকৃষ্ণ-যিশুখ্রিস্ট

যদু মল্লিকের বাগান বাড়িতে একদিন বাগান বেড়াতে এসেছে রামকৃষ্ণ। বৈঠকখানায় বসে গল্প করছে যদুর সঙ্গে। হঠাৎ দেয়ালে টাঙানো একখানা ছবির দিকে তার নজর পড়ল। বড় মধুর ভাবের ছবিখানি।

মা আর ছেলে। মা'র নধর বাহুর বেষ্টনীতে পবিত্র একটি শিশু, ঊষার আকাশে প্রথম উদয়ভানু।

মা'দুটি বড় বড় বিভোর চোখে দ্রবীভূত স্নেহ, মুখে তৃপ্তিপূর্ণ হাসি। আর শিশুর মুখে সে যে কি নিস্পাপ সারল্য তা রামকৃষ্ণ যেমন বুঝেছে তেমনি কি কেউ বুঝবে?

"ওরা কারা হে?"

"এক মেমসাহেব আর তার ছেলে।"

তাই হবে বা। অন্যদিকে চোখ ফেরাতে চাইল রামকৃষ্ণ। কিন্তু চোখ ফেরায় এমন সাধ্যি নেই।

“বলো না সত্যি করে। ওরা কে? ও তো দেখছি জ্যোতির্ময় শিশু। আর ওর মা তো পুণ্যময়ী পবিত্রতা।”

“মা মেরী আর তার ছেলে যীশুখ্রিস্ট।”

একদৃষ্টে চেয়ে রইল রামকৃষ্ণ। দেখল যশোদা আর তার ছেলে বালগোপাল।

সোজা শম্ভু মল্লিকের কাছে গিয়ে হাজির হল। বললে,–

“যীশুখ্রিস্টের গল্প শোনাও আমাকে। জানোই তো আমার বিদ্যেবুদ্ধি। তবে এবার আমায় একটু বাইবেল শোনাও দিকি।”

শম্ভু মল্লিক বাইবেল নিয়ে বসল। আবিষ্টের মত শুনতে লাগল রামকৃষ্ণ।

ভূমাভিমুখী মন নামল অবগাহনে।

পরে একদিন উন্মনার মত চলে এল যদু মল্লিকের বাগান বাড়িতে। যদু মল্লিক বাড়ি নেই। বৈঠকখানা খুলে দিল চাকররা। শিশুযুতা মাতৃচিত্রের কাছে বসল রামকৃষ্ণ।

“মা গো তুই আমাকে একি দেখাচ্ছিস?”

BANGLADARSHAN.COM

রামকৃষ্ণ দেখল সেই ছবি যেন জীবনায়িত হয়ে উঠেছে। মা আর ছেলের দিব্য অঙ্গের জ্যোতিতে ভেসে যাচ্ছে দশ দিক। তার অন্তর-বাহির ধুয়ে যাচ্ছে সেই জ্যোতিস্নানে। এতদিনের দৃঢ়মূল সংস্কার উন্মিলিত হয়ে যাচ্ছ। বিশ্ব-সংসারে আর কেউ বিরাজমান নয়–শুধু পীযূষপ্রেমময় যীশু। কৃষ্ণ নয়, খ্রিস্ট। ঈশান নয়, ঈশা।

দেখল এ-ঘর যেন গীর্জা হয়ে গিয়েছে। নানা ধূপ দীপ মোমবাতি জ্বেলে ব্যাকুলতার মূকমূর্তি হয়ে প্রার্থনা করছে পাদরীরা। সামনে ক্লেশভার ক্লিষ্ট অথচ অক্লিষ্টকান্তি দেবতা।

কে তুমি পরম যোগী, পরম প্রেমিক? কে তুমি “আদিত্যবর্ণং তমস: পরস্তাৎ?” সংসারদুঃখগহন থেকে জীবের উদ্ধারের জন্য বুকের রক্ত ঢেলে দিলে। যাকে ত্রাণ করতে এলে, তারই হাতে প্রাণ দিলে হাসিমুখে। এলে যে যন্ত্রণার নিবারণে, সেই যন্ত্রণায় ক্ষমা হয়ে, প্রেম হয়ে শান্তি হয়ে উদ্ভাসিত হল।

হাঁটতে হাঁটতে চলে এল এক গীর্জার সামনে। বড় রাস্তার পারে বড় গীর্জা। সব বিদেশী-বিজাতীয়দের ভীড়।” রাজার বেটা না হোক, সব রাজার জাতের লোক। ভিতরে ঢুকতে সাহস পেল না রামকৃষ্ণ। কে জানে, হয়তো বা কালী-ঘরের খাজাঞ্চি বসে আছে।

“মা গো, খৃষ্টানদের গির্জেতে তোমাকে কি করে ডাকে একবার দেখিও। কিন্তু ভিতরে গেলে লোকে কি বলবে? যদি কিছু হাঙ্গামা হয়? আবার কালী-ঘরে ঢুকতে না দেয়? তবে মা, গির্জের দোরগোড়া থেকেই দেখিও।”

গির্জের দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াল রামকৃষ্ণ। চক্ষু মেলে তাকাল একবার ভিতরে। সর্বতচক্ষু রামকৃষ্ণের চোখে এখন "পরম পশ্যন্তী দৃষ্টি।"

দেখল সত্যিই এ-কালী ঘর। ভিতরের বেদীতে মা বসে আছেন, মা জগদম্বা। ভবতারিনী। সব্যে খড়্গমুন্ডকরা, অসব্যে বরাভয়দাত্রী–সেই মা, যিনি করালী হয়েও কৈবল্যদায়িনী। আনন্দধারায় দুই চোখ ভেসে গেল রামকৃষ্ণের।

সর্বত্রই এই মা'র ভজন। সর্বস্থানই মাতৃস্থান। কাজলের ঘরে বাস করলে গায়ে কালি লাগবেই, কিন্তু কোথাও আর কাজলের ঘর নেই, সর্বত্র কালী-ঘর।

তিনদিন থাকল এই খৃস্টানভাবে। চারদিনের দিন পঞ্চবটীতে বেড়াচ্ছে রামকৃষ্ণ, দেখল কে একজন গৌরবর্ণ সুপুরুষ হঠাৎ তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। বুঝতে দেরী হল না বিদেশী বিজাতি। কিন্তু সৌম্য আননে কি অপার সৌন্দর্য, সর্বাঙ্গে দেবদ্যুতি।

কে তুমি? তুমিই কি সেই পুরুষত্তম যীশু? তুমিই কি সেই তমালশ্যামল বনমালী?

সেই দেবমানব আলিঙ্গন করল রামকৃষ্ণকে। এক দেহে লীন হয়ে গেল দুজনে। লীন হয়ে গেল ব্রহ্মবোধে।

BANGLADARSHAN.COM

"আচ্ছা তোরা তো সবাই বাইবেল পড়েছিস–"

একদিন ভক্তদের জিজ্ঞাসা করলেন ঠাকুর,

"সেইখানে যীশুর চেহারার কোনো বর্ণনা আছে?"

"না, বাইবেলে তার উল্লেখ নেই।"

"আচ্ছা, যীশু কেমন দেখতে ছিল বলতো?"

"কে জানে! তবে ইহুদী ছিলেন যখন, তখন রং গৌর চোখ টানা আর নাক টিকালো ছিল নিশ্চয়ই।"

"কিন্তু আমি যখন দেখেছিলাম, দেখলাম নাক একটু চাপা। কেন দেখলাম কে জানে!"

ভাবে-দেখা মূর্তি কি আর বাস্তব মূর্তির অনুরূপ হয়? কিন্তু যীশুখ্রীস্টের আকৃতির যে বর্ণনা পাওয়া গেছে, তাতে তাঁর নাক চাপা বলেই লেখা আছে।

"মা গো, সবাই বলছে আমার ঘড়ি ঠিক চলছে। হিন্দু, মুসলমান, খৃস্টান ব্রহ্মজ্ঞানী। সকলেই বলে আমার ধর্ম ঠিক। কিন্তু মা, কারুর ঘড়িই তো ঠিক চলছে না। তোমার ঘড়ির সঙ্গে তো কেউই মিলিয়ে নিচ্ছে না ঠিক-ঠিক। সবাই ঘড়ির কাঁটা দেখে, কেউ-ই তোমাকে দেখে না।"

মিশ্র এসেছে ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করতে। ধর্মে খৃষ্টান, বাড়ি পশ্চিমে। ভাই গিয়েছিল বিয়ে করতে, সেখানে বরের সভায় সামিয়ানা চাপা পড়ে মারা যায়। একা নয়, সঙ্গে আরো একটি ভাই–গিয়েছিল বরযাত্রী। সেই থেকেই মিশ্র সন্ন্যাসী। পরনে প্যান্ট কোট বটে, কিন্তু ভিতরে গেরুয়ার কৌপীন।

“ইনিই ঈশ্বর, ইনিই রাম, ইনিই কৃষ্ণ–” বলতে লাগল মিশ্র।

ঠাকুর হাসছেন। বলছেন, “পুকুরে অনেকগুলি ঘাট। এক ঘাটে হিন্দুরা জল খাচ্ছে, বলছে জল। আরেকঘাটে খৃষ্টানরা খাচ্ছে, বলছে ওয়াটার। মুসলমানরা আরেকঘাটে খাচ্ছে, বলছে পানী।”

মিশ্রের দিকে তাকালেন ঠাকুর, বললেন, “কিছু দেখতে-টেকতে পাও?”

“শুধু আপনাকে দেখি। আপনি আর যীশু এক।”

ঠাকুরের বুঝি যীশু ভাব হল। দাঁড়িয়ে পড়লেন। সমাধিস্থ হয়ে গেলেন। ভাবাবেশে মিশ্রর দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগলেন। শেকহ্যান্ড করতে লাগলেন।

“পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ”

লেখক–শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

BANGLADARSHAN.COM

ওঁ নিরঞ্জনং নিত্যমনন্তরূপম্
ভক্তানুকম্পাধৃতবিগ্রহং বৈ
ঈশাবতারং পরমেশমীড্যং ত্বং
রামকৃষ্ণং শিরসা নমামি।

ওঁ ভগবতে শ্রীরামকৃষ্ণায় নমঃ

মা এই বইটা পড়ে এতো প্রভাবিত হন যে বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশনে যোগাযোগ করে বাবার সঙ্গে দীক্ষা নেন স্বামী আত্মস্থানন্দজীর কাছে। এই দীক্ষা আমার মায়ের জীবনদর্শনের আমূল বদল ঘটিয়ে দেয়। পরে আমার বোনও দীক্ষা নেয় স্বামী আত্মস্থানন্দজীর কাছে। মা ভীষণ শান্তি পেয়েছিলেন ওখানে দীক্ষা নিয়ে এবং আমাকে অনেক আশীর্বাদ করেছিলেন। আমাদের জাতীয় জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীসারদা মা আর স্বামীজীর মত উচ্চ কোটির আদর্শ, আমার মনে হয়, খুবই বিরল। আমাদের মনে হয়েছিল যে ঠাকুর, শ্রীমা এঁদের আমরা সঙ্গ করতে পারলাম না, এটাই জীবনের সবচেয়ে বড়ো আফশোস। যত এঁদের সম্পর্কে জেনেছি, ততই আমাদের আফসোস বেড়েছে। তখনও জানিনা তাঁদের কৃপা কি ভাবে আমাদের কাছে আসবে। মায়ের ইচ্ছে হয়েছিল আমরাও রামকৃষ্ণ মিশনে দীক্ষা নিতে যাই। কিন্তু সেটা না হলেও আমি আমার জীবনে ওই দিব্য তিন বট বৃক্ষের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে গেলাম অন্যভাবে।

আমাদের দীক্ষা হল ক্রিয়াযোগের ঘরে, দীক্ষার পরে আমাদের গুরুমায়ের সান্নিধ্যে এসে জানলাম, বেশ কিছু উচ্চ কোটির মহাত্মার প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকারে, যাঁদের অন্যতম বরফানি দাদাজী মহারাজ ও বিন্ধ্যাচলের হংসবাবার শ্রীমুখে, যে আমাদের গুরুমা শ্রীসারদা মায়ের সত্তা যিনি এজন্মে শ্রীশ্রী মা সর্বাণী আর আমাদের পরমগুরু শ্রীশ্রীসরোজবাবা ছিলেন ঠাকুরের সত্তা। পরে আমাদের গুরুমা নিজেও সেটা বলেছেন। একবার খুব জ্বর হয়েছে আমার, বাড়িতে সন্দেহ করছে ডেঙ্গি হয়েছে, একসপ্তাহ বিছানা থেকে উঠতে পারিনি, জ্বরে বেহুঁশ, রোজের ক্রিয়া পুজো সব বন্ধ, মনে ভীষণ গ্লানি হচ্ছে এগুলো বাদ যাচ্ছে বলে। ছদিনের দিন জ্বরের ঘোরে শুনলাম ঠাকুরের আশ্বাস, "কোনো চিন্তা নেই, শুধু একটা হাত দিয়ে তাঁর চরণটা ছুঁয়ে থাক, সব ঠিক হয়ে যাবে।" তারপরেই জ্বর ছেড়ে গেল, আমি ঠিক হয়ে গেলাম। আরেকবার গুরুমায়ের কাছে গানের ক্লাসে বসে গান গাইছি, সেই ঘরে ঠাকুরের একটা ছবি আছে, হঠাৎ সেই ছবির মুখটা দেখলাম একটা নীল আলোর মধ্যে দিয়ে আমার আজ্ঞাচক্রে প্রতিফলিত হচ্ছে। আমি কেঁদে ফেললাম, গুরুমা ঠিক দেখেছেন, বললেন, "তুমি যে আমাকে খুব ভালোবাস, তাই তোমার কাছে উনি গেছেন।" এই লেখা লিখতে না বসলে এই কথা প্রকাশ করতাম না হয়তো, বলার উদ্দেশ্য একটাই, এঁরা আজও সূক্ষ্মে প্রতিনিয়ত শরণাগতকে আগলে রেখেছেন।

এরপরের ঘটনা এই বছরের। অফিসে আমার সহকর্মী ছিল আমার চেয়ে ছোট যাকে আমার অনুজ মনে করি কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার শ্রীবিজিতেন্দ্র মিত্র। ২০০৫ সালে সে আমাদের অফিস ছেড়ে অন্য জায়গায় জয়েন করে, বহুদিন যোগাযোগ ছিল না। হঠাৎ এবছর সেপ্টেম্বর মাসে সে যোগাযোগ করল, এখন সে ব্যাঙ্গালোরবাসী, ওখানে একটা কোম্পানির উচ্চপদে আসীন, আমার সঙ্গে এখনো সমান আন্তরিক, এখনো সে আমার "বিজু" আর আমি ওর "পম্পাদি।" সে একদিন জানালো যে স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ ছিলেন তার ঠাকুরদাদার ছোটো ভাই যিনি কিশোর বয়সে ঠাকুরের সংস্পর্শে আসেন এবং পরে সন্ন্যাস নেন।

BANGLADARSHAN.COM

প্রসন্ন [সারদাপ্রসন্ন মিত্র–স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ] (১৮৬৫-১৯১৫)–চব্বিশ পরগণা জেলার নাওরা গ্রামে মাতুতালয়ে জন্ম। পিতা শিবকৃষ্ণ মিত্র। মাতামহ পাইকহাটীর নীলকমল সরকার একজন জমিদার। সারদাপ্রসন্ন ছিলেন কথামৃতকার মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের ছাত্র। মেধাবী হয়েও প্রবেশিকা পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য বিশেষ দুঃখ পান। মাস্টার মহাশয় এইজন্য বিষাদগ্রস্ত ছাত্রকে দক্ষিণেশ্বরে নিয়ে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশে তিনি শ্রীশ্রীমায়ের নিকট নিয়ে যেতেন। অভিভাবকরা তাঁর বিবাহের চেষ্টা করলে তিনি বাড়ি থেকে পালিয়ে যান। প্রথমে কাশীপুরে শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট যান। পরে পুরীধামের পথে রওনা হন। কিন্তু ফিরে আসতে বাধ্য হন। মেট্রোপলিটন কলেজ থেকে এফ্ এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বরাহনগরে মঠে যোগ দেন এবং সন্ন্যাস গ্রহণের পরে তাঁহার নাম হয় স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ। দুঃসাহসিকতার প্রতি একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ থাকায় তীর্থ ভ্রমণের সময় অনেক বিপদের সম্মুখীন হতে হয়। শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর প্রতি তাঁর অপরিসীম ভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তীর্থ থেকে ফিরে নানা জনহিতকর কাজে আত্মনিয়োগ করেন। দুর্ভিক্ষে সেবাকার্য, উদ্বোধন পত্রিকার প্রকাশনা এবং ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে বেদান্ত প্রচারে বিদেশযাত্রা তাঁর কর্মময় জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। আমেরিকার সানফ্রান্সিস্‌কো, ক্যালিফোর্নিয়া প্রভৃতি শহরে বেদান্ত প্রচারের কাজে তাঁর শেষ জীবন

কাটে। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে সানফ্রান্সিস্‌কো শহরে হিন্দুমন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেন। পাশ্চাত্যে এইটি প্রথম হিন্দুমন্দির। ক্যালিফোর্নিয়ার পার্বত্য অঞ্চলে 'শান্তি আশ্রম' নামে একটি শাখা কেন্দ্র শুরু করেছিলেন। Voice of Freedom নামে একটি মাসিক পত্র এবং লস এঞ্জেলস নগরে বেদান্ত সমিতি স্থাপন তাঁর বিশেষ উদ্যোগের পরিচায়ক। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারি তিনি দেহত্যাগ করেন।

তাঁর পৈতিক বসতবাটি যেটি খান্না সিনেমার কাছে অবস্থিত বহুদিন শরিকি বিবাদের জেরে পড়েছিল এবং ভেঙে পড়ছিল, কিছুদিন আগে সেই বিবাদ মেটে এবং বাড়িটি রামকৃষ্ণ মিশনের হাতে দিলে তাঁরা সংস্কার করে সেটিতে রামকৃষ্ণ মিশনের মঠ তৈরী হয়ে সর্বসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হয়। এই শেষের বাড়ি সংক্রান্ত ব্যাপারটা আমি শুনি শ্রীবিজিতেন্দ্রের মুখে যে স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের বংশের উত্তরপুরুষ।

আমার আরেক সহকর্মী শ্রীশান্তনু ঘোষ, সেও আমার কর্তার বিশেষ ঘনিষ্ঠ যে ঠাকুরের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত গৃহীসন্তান "দানা কালী"র বংশধর। ওর মুখেই প্রথম শুনি "দানা কালী"র কথা এবং জানতে পারি ওদের পরিবারের প্রতি ঠাকুরের বিশেষ কৃপা পাওয়ার কথা, ঠাকুরের ওদের বাড়িতে আসার কথা। কালীপদ ঘোষ (১৮৪৯-১৯০৫)–'দানা-কালী' নামে শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘে পরিচিত। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত গৃহীশিষ্য। উত্তর কলকাতার শ্যামপুকুরে প্রসিদ্ধ ঘোষ কোম্পানিতে চাকুরী করতেন। প্রথম দর্শন ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণেশ্বরে। ন্যাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে তাঁর খুব হৃদ্যতা ছিল। ভক্তগণ এঁদের দুইজনকে একত্রে জগাই মাধাই বলতেন। তিনি বহু গান লিখেছিলেন যা "রামকৃষ্ণ সঙ্গীত" নামে প্রকাশিত হয়। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁকে 'দানা' বলে সম্বোধন করেছিলেন। ভাগ্যবান কালীপদর জিহ্বায় ঠাকুর "কালী" নাম লিখে দিয়েছিলেন এবং ঠাকুর তাঁকে বিশেষ কৃপা দান করেন। সেইদিনই অযাচিতভাবে কালীপদর শ্যামপুকুরের বাড়িতে ঠাকুর প্রথম শুভাগমন করে পুনরায় দক্ষিণেশ্বরে ফিরে আসেন। কালীপদর বাড়িতে ঠাকুর আরও কয়েকবার শুভাগমন করেন এবং কাশীপুরে "কল্পতরু" হওয়ার দিনেও কালীপদর বক্ষঃস্পর্শ করে তাঁকে আশীর্বাদ করেন। সুগায়ক, বেহালা ও বংশীবাদক কালীপদর বাঁশী শুনে একদা ঠাকুর সমাধিস্থ হয়েছিলেন। পরবর্তী কালে বোম্বাইতে অবস্থানকালে শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী সন্তানগণ তাঁর গৃহে অতিথি হতেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের একনিষ্ঠ ভক্ত কালীপদ ঘোষ কলিকাতাতেই দেহত্যাগ করেন। শ্রীশান্তনু ঘোষ এখন থাকেন বরাহনগরে। এদের বাড়িতে আমাদের যাতায়াত আছে।

BANGLADARSHAN.COM

উপরে বর্ণিত দুটি পরিবারই আমাদের পরিবারের বিশেষ ঘনিষ্ঠ এবং এঁরা ঠাকুর, শ্রীশ্রীমা সারদা ও বিবেকানন্দের প্রতি সমর্পিত প্রাণ। আমার বোনের শ্বশুরবাড়ির লোকজন সবাই রামকৃষ্ণ মিশনের দীক্ষিত। এঁরা আমার এক্সটেনডেড ফ্যামিলি। তাই আমরা ঠাকুর এবং মায়ের কৃপার ছায়াতেই আছি এটা আমার কাছে খুব স্বস্তির, আনন্দদায়ক আর সেই সঙ্গে এমন দিব্য সত্তার সদ্গুরু আশ্রিত বলে মনের সংশয়টা নেই।

॥আলোর সোপান॥

“একা মোর গানের তরী
ভাসিয়ে ছিলাম নয়ন জলে
সহসা কে এলে গো এ তরী বাইবে বলে,
ভাসিয়ে ছিলাম নয়ন জলে।”

থিয়েটার রোডের চার্টার্ড ফার্মে কাজ করার সময় আমার এক কলিগ আমাকে একদিন নিয়ে গেল থিয়েটার রোড অরবিন্দ ভবনে। পন্ডিচেরির অরভিলে আমি গেছিলাম আগে দক্ষিণ ভারতে ভ্রমণের সময়। আমাদের বাড়িতে শ্রীঅরবিন্দের আর শ্রীমার কয়েকটা বই আমার পড়া ছিল, এই মহাত্মাদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা ছিল কিন্তু অরবিন্দ ভবন চিনতাম না। প্রথম বার অরবিন্দ ভবনে গিয়ে তাই ওখানকার প্রতি একটা আত্মিক সংযোগ অনুভূত হল এবং অরবিন্দ ভবন জীবনে জড়িয়ে গেল, শুধু আমার জীবনেই নয় আমার বর এবং মেয়ের জীবনেও। মন ভালো থাকুক বা খারাপ, কোনো বিপদে পড়েছি বা কোন ভালো খবর পেয়েছি, আমাকে একবার অরবিন্দ ভবনে যেতেই হবে। আমার অফিসের কাছে বলে লাঞ্চের সময় বা বাড়ি ফেরার সময় চলে যেতাম। আস্তে আস্তে ওখানকার লাইব্রেরির মেম্বার হলাম, ওখানে গিয়ে চুপচাপ বসে থাকতাম, যখন বেরোতাম মনে যেন একটা আনন্দের অনুভূতি হত। বিয়ে হল, মেয়ে হবার আগে সোনোগ্রাফি করাতে যাব, আমার ডাক্তারের প্রেসক্রাইবড জায়গা ওয়েস্টার্ন ডায়াগনস্টিক হল অরবিন্দ ভবনের পাশের বাড়িটা। যতবার সোনোগ্রাফি করিয়েছি, অরবিন্দ ভবনে গিয়ে প্রণাম করে ঢুকেছি ওয়েস্টার্ন ডায়াগনস্টিকে। শ্রীমায়ের উপস্থিতি যেন পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে ওখানে। মেয়ে হল, মেয়েকে নিয়েও গেছি, মেয়েরও খুব ভালো লাগে ওখানে গেলে। এখনো আমাদের ওখানে নিয়মিত যাতায়াত আছে।

BANGLADARSHAN.COM

এর মধ্যে বেশ কিছু ভালো বই আমাদের অসম্ভব প্রভাবিত করেছে, সংঘগুরু সুদীনবাবার বই, পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ, তপোভূমি নর্মদা, দিলীপকুমার রায়ের লেখা কিছু বই এবং অবশ্যই ভারতের সাধকের বেশ কয়েকটা খণ্ড। একে একে বিভিন্ন বই পড়তে পড়তে উপলব্ধি করলাম সমর্থ গুরু বিনা আমায় সঠিক পন্থা আর কেউ দেখাতে পারবেন না। ২০০৩-এর ডিসেম্বরে আমার বর Art of Livingএর বেসিক কোর্স করে এসে বলল আমাকে ওই কোর্সটা করতে, আমি আর আমার বোন এনরোলমেন্ট করলাম ফেব্রুয়ারীতে করব। তার আগে ২০০২-এর শেষের দিকে আমার মাকে একরকম জোর করে “পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ” পড়াই, মা এতো প্রভাবিত হন যে বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশনে যোগাযোগ করে বাবার সঙ্গে দীক্ষা নেন স্বামী আত্মস্থানন্দজীর কাছে। এই দীক্ষা আমার মায়ের জীবনদর্শনের আমূল বদল ঘটিয়ে দেয়। মা ভীষণ শান্তি পেয়েছিলেন ওখানে দীক্ষা নিয়ে এবং আমাকে অনেক আশীর্বাদ করেছিলেন। আমাদের জাতীয় জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীসারদা মা আর স্বামীজীর মত উচ্চ কোটির আদর্শ, আমার মনে হয়, খুবই বিরল। মায়ের ইচ্ছে হয়েছিল আমরাও রামকৃষ্ণ মিশনে দীক্ষা নিতে যাই। তাই Art of Living-এর কোর্সে এনরোল করাতে মা একটু অসন্তুষ্ট হন। ২০০৪-এর

ফেব্রুয়ারীর মাঝামাঝি মা চলে গেলেন হঠাৎ। আমরা খুবই ভেঙে পড়লাম। মায়ের যেদিন নিয়মভঙ্গের কাজ সেদিন সন্ধ্যেবেলা থেকে আমাদের Art of Living-এর কোর্স শুরু হল। ভীষণ বিক্ষিপ্ত মন, অসম্ভব মানসিক টানাপোড়েন আর মাতৃবিয়োগের অতল শূন্যতা নিয়ে শুরু হল কোর্স, ছদিনের কোর্সে সুদর্শন ক্রিয়া শিখলাম এবং কোর্স চলাকালীন আমরা দুই বোনই অঝোরে কেঁদেছি। তখন Art of Living-এর Advance কোর্স হত শুধু ব্যাঙ্গালোরে। বেসিক কোর্সের শেষ দিন যখন আমাদের টিচার সেটা জানালেন আমি শুধু ঈশ্বরের কাছে মনে মনে বলেছিলাম যে আমার পক্ষে অফিস, ছোট বাচ্চা সামলে ব্যাঙ্গালোরে গিয়ে কোর্সটা করা সম্ভব নয়, যদি আমাকে এই কোর্সটা করতে হয় তবে সেটা কলকাতায় হলেই আমি করব, নচেৎ আর হল না। জুন মাসের মাঝামাঝি একদিন লং ক্রিয়া করতে গেছি আমাদের বেহালার Art of Living-এর সেন্টারে, সেখানে বলল এই প্রথমবার Advance কোর্স হবে কলকাতায় নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে, টানা পাঁচদিনের কোর্স যার মধ্যে চারদিন মৌন থাকতে হবে, শ্রীশ্রীরবিশঙ্করজী স্বয়ং কোর্স করাবেন। Art of Living-এর যে কোনো কোর্সে বেশ কিছু বিধিনিষেধ পালন করতেই হয়, যেমন পুরো কোর্সের সময়টা নিরামিষ ভোজন, চা কফি বাদ, কথা কম বলা, প্রচুর জলপান, একদম হাল্কা সেদ্ধ খাবার ইত্যাদি সংযম পালন করতে হয়। আমি আর আমার বর এনরোল করলাম, কিন্তু সমস্যা হল মেয়েকে নিয়ে। আমরা মৌন থাকলে ওর খুব অসুবিধে হবে। আমার বোন বলল ও মেয়েকে ম্যানেজ করবে। আমরা নির্বিঘ্নে Advance কোর্স করলাম, ভোর পাঁচটায় বাড়ি থেকে বেরোতাম আর বাড়ি ফিরতে ফিরতে রাত নটা বাজত। খুব ভালো লাগল এই কোর্সটা করে। আস্তে আস্তে Art of Living-এর একদম শেষেরটা ছাড়া সব কটা কোর্স করা হল। যখনই শ্রীশ্রীরবিশঙ্করজী কলকাতায় আসতেন আমরা সপরিবারে দৌড়োতাম, মেয়েকেও Art Excel আর যোগের কোর্স করালাম। কিন্তু "তবু যে ভরে না চিত্ত।" কারণ এখানে শারীরিক সমস্যা কম হলেও আধ্যাত্মিক সোপানটি পেলাম কই?

BANGLADARSHAN.COM

ইতিমধ্যে পড়ে ফেলেছি পরমহংস যোগানন্দের "যোগীকথামৃত", সেখানে শ্রী অশোককুমার চট্টোপাধ্যায়ের সম্পর্কে জেনে গেলাম তাঁর কাছে, তিনি আমাদের ক্রিয়াযোগে দীক্ষা দিলেন বটে কিন্তু একটা যেন ফাঁক রয়েছে কোথাও। আস্তে আস্তে তাঁর ওখানে যাওয়া বন্ধ করলাম। হাতে এল নিগূঢ়ানন্দের লেখা "দিব্য জগৎ ও দৈবী ভাষা" বইটি। ভীষণ ভালো লাগল, ধীরে ধীরে ওর লেখা আরো বই পড়লাম, ওঁর সাথে যোগাযোগ হল, গেলাম দেখা করতে। উনি বেশ কয়েকবার দেখা করে স্বীকার করলেন যে দীক্ষা দেবার ক্ষমতা ওঁর নেই। পরে শুনেছিলাম উনি এক উচ্চকোটির সাধকের সঙ্গ করে তাঁর সাধনজীবনে নিজের নাম দিয়ে লিখেছেন।

একে একে দুজন তান্ত্রিকের সঙ্গে পরিচয় হল, তাঁরা পারলে তখনি দীক্ষা দিয়ে দেন আর কি, আমরা এক প্রকার পালিয়ে বাঁচলাম। আরেক জায়গায় গেলাম, তাঁর দেখা হবে না, হবেনা বলে দেখা করেই বললেন দীক্ষা দেবেন এবং পাঁচ বছরের মধ্যে জ্যোতি দর্শন করিয়ে দেবেন। সেখান থেকেও পালিয়ে এলাম। মনে খুব সংশয়, তাহলে কি এভাবেই আমাদের জীবন কাটবে? রোজ ভগবানের কাছে বলি, "আমাদের তুমি আলোর পথটা দেখাও।"

পাড়ার একজন পরিচিত ভদ্রলোকের সঙ্গে একদিন কথা হচ্ছিল, কথা প্রসঙ্গে তিনি বললেন একবার তাঁর গুরুমায়ের কাছে যেতে, এই ভদ্রলোক বিগত চার বছর ধরে আমায় বলছেন তাঁর গুরুমায়ের কথা আর আমি তাঁকে খালি বলে যাচ্ছি যে এখনকার সব গুরু জাল, ভণ্ড। এবার যখন বললেন তিনি আমি যেতে রাজি হয়ে গেলাম, উনি সঙ্গে একজনকে দিলেন যিনি আমাদের সঙ্গে যাবেন। সেটা একটা রাসপূর্ণিমার দিন। আমরা সপরিবারে সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে গেলাম সেই আশ্রমে। যিনি সঙ্গে নিয়ে গেছেন রাস্তায় আমাদের বলে দিয়েছেন এগিয়ে গিয়ে যেন কথা না বলি আর কোনো প্রশ্ন যেন না করি ওঁর গুরুমাকে। যাইহোক, গিয়ে আশ্রমে পৌঁছলাম, একটু পরে ওঁর গুরুমা আর সতীর্থরা এসে বসলেন এবং রাসপূর্ণিমা উপলক্ষে গানের অনুষ্ঠান শুরু হল, বসে শুনলাম। এবারে সকলে একে একে গিয়ে প্রণাম করছে লাইনে দাঁড়িয়ে, আমরাও দাঁড়ালাম, যখন সামনে গিয়ে প্রণাম করছি, তখন গুরুমা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন যে কোথা থেকে এসেছি, সঙ্গে কে কে আছে, কার সঙ্গে এসেছি। গুরুমায়ের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে জানতে চাইলাম উনি আলাদা দেখা করেন কিনা এবং কিভাবে। উনি বললেন যে দেখা করেন, আর আমাদের ফোনে জেনে নিয়ে যেদিন দেখা করেন সেদিন আবার যেতে বললেন। আমরা প্রণাম করে বেরোলাম, বেরিয়ে আমার কর্তাকে বললাম যে আর কোথাও যাবার নেই আমার, যাকে যেভাবে খুঁজছিলাম পেয়ে গেছি। এরপরে ওঁর সঙ্গে দেখা করলাম আমরা এবং যেদিন দীক্ষা হল সেদিন উপলব্ধি করলাম ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আর শ্রীসারদা মা কেন আজও "ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু", আমরা প্রথম থেকে তাঁদের প্রতি যে শরণাগতি চেয়েছিলাম।

BANGLADARSHAN.COM

আস্তে আস্তে তাঁর কাছে যাতায়াত করতে করতে তাঁর কৃপালাভ হল, আমাদের তিনি শুধু আশ্রয় নয়, তাঁর কৃপার অমৃত অবগাহন করিয়ে কাছে টেনে নিলেন। আলোর পথটা শুধু দেখালেন না, সর্বাস্থায় তিনি সহায় হয়ে হাতটা ধরে নিয়ে চলেছেন। আমাদের জীবনের আলোকবর্তিকা হয়ে তিনি সদা জাগ্রতা জননী তথা গুরু হিসেবে অবতীর্ণ হয়েছেন। নিজেকে প্রচ্ছন্ন রেখে, প্রচারবিমুখ হয়েও যে কিভাবে লোককল্যাণের ব্রত পালন করা যায়, ওঁর সান্নিধ্যে এসে সেটা দেখেছি। আমরা সপরিবারে কৃতজ্ঞ ওঁর কাছে এবং ঈশ্বরের কাছে যে ওঁকে এমন অন্তরঙ্গ ভাবে আমরা আমাদের জীবনে পেয়েছি। আজ যে আমি লিখতে বসেছি, আমার প্রথম লেখা কবিতা আর স্তব তিনি আশ্রমের পত্রিকাতে ছাপিয়েছেন। কত বলব, "আপনাকে যে দেব তবু বাড়বে দেনা।" ওঁর কাছে দাঁড়ালে মনে হয়, "তোমায় কেন দিইনি আমার সকল শূন্য করে?" তাই ওঁর ভাষাতেই ওঁর প্রতি সশ্রদ্ধ চিত্তে বলতে ইচ্ছে করে,

"জয়তী দেব জয়তী দেব জয় দয়ালু দেব,
পরমগুরু পরম পূজ্য পরম দেব দেব।"

এখানে এতো কথা লেখার কারণ আমাদের মত এইরকম অলীকমায়ার ভাঙা কাঁচের জালে জড়িয়ে অনেকেরই আসল রত্নের জ্যোতি জীবনে ধরা দেয় না, তাই সাবধান হয়ে এগোতে হবে।

॥অন্নদোষ॥

চল্লিশের দশকের একদিন। আশ্বিনের এক শিশিরভেজা ভোরে বৃন্দাবনের গোপীনাথ মন্দির থেকে বেরিয়ে গুজরাটের দিকে চলেছেন সন্ন্যাসী অমলানন্দ স্বামী। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের দণ্ডি সন্ন্যাসী অমলানন্দ স্বামী ইষ্টগত প্রাণ, নিয়মনিষ্ঠ, অতি শুদ্ধাচারী এবং নির্লোভ। মাত্রই পনের বছর বয়সে ব্রহ্মচর্য নিয়ে আঠাশে সন্ন্যাস লাভ করেন গুরু দিব্যানন্দ ভারতীর কাছে। এখন তিনি চল্লিশের কোঠায়। প্রভাস তীর্থের বিষ্ণুমন্দির তাঁর গন্তব্য, প্রভাস তীর্থে তিন রাত্রি কাটিয়ে দ্বারকায় যাবেন তিনি। কাঁধের কাপড়ের ঝোলাটিতে যৎসামান্য কিছু অর্থ, কিছু শুদ্ধ গেরুয়া বস্ত্র, হরিচন্দনের ছোট কৌটা, একটি জলপানের জন্য মৃৎভান্ড আর কিছু ফলমূল রয়েছে।

সারাদিন হেঁটে ধূলিমলিন দুটি পদযুগল আর ঘামে, পথশ্রমে ক্লান্ত দেহটা নিয়ে তিনি উপস্থিত হলেন একটি বর্ধিষ্ণু গ্রামে। গ্রামের ঠিক মধ্যস্থলে একটি বিরাট চণ্ডীমণ্ডপ সংলগ্ন মন্দির দেখে সেই দালানটিতে বসলেন বিশ্রাম নিতে, ভীষণ তৃষ্ণা অনুভূত হল তাঁর। চারিদিকে ভালো করে দৃষ্টি ছড়িয়ে দেখলেন চণ্ডীমণ্ডপ সংলগ্ন মন্দিরের পাশে বিরাট একটি অট্টালিকা আর সেই অট্টালিকার সামনে রয়েছে টলটলে জল ভর্তি একটি সরোবর। সরোবরের একদিকের একটি ঘাট মন্দির লাগোয়া, আরো ঘাট রয়েছে, আরেকটি সেই অট্টালিকা সংলগ্ন। তিনি ধীরে ধীরে উঠে সেই ঘাটে নেমে তাঁর ঝোলার সেই মৃৎভান্ডটি বের করে অনেকটা জল খেলেন, মুখে চোখেও অনেকটা জল দিলেন, ক্লান্তি খানিকটা অপনোদন হল। এবার সিঁড়ি দিয়ে উঠে এসে ঝোলাটি পাশে নামিয়ে বিশ্রাম নেবার ইচ্ছায় আরাম করে বসলেন সেই চণ্ডীমণ্ডপে। প্রায় ঘুমিয়েই পড়েছিলেন তিনি হঠাৎ বারংবার “নমো নারায়ণায়” ডাকে সচকিত হয়ে দেখেন এক সম্ভ্রান্ত চেহারার ভদ্রলোক তাঁকে ডাকছেন। তিনি এসে স্বামীজীকে অনুরোধ করেন মন্দির সংলগ্ন ঘরে গিয়ে আহার করতে, স্বামীজী গেলেন সেখানে, গিয়ে দেখলেন মন্দিরের পাশে পাকশালে তাঁর জন্য চাল, ডাল, মশলা, সব্জি সব মজুত করেছেন সেই ভদ্রলোক যিনি ছিলেন ওখানকার ভূস্বামী আর তাঁর পাকে সাহায্যের জন্য নিযুক্ত করেছেন ওই মন্দিরের পুরোহিতমশাইকে। মন্দিরে ঢুকে স্বামীজী দেখলেন সালংকারা রাধামাধবের সঙ্গে একপাশে একটি সালংকারা মাতৃমূর্তিও আছে, তিনি প্রণাম করে সেই সরোবরে গিয়ে স্নান করে এসে রান্না করলেন, রান্না করে সেই পুরোহিতের সঙ্গে বসে আহার করলেন। ভূস্বামীটি তাঁকে অনুরোধ করলেন রাতটুকু সেই মন্দিরে কাটিয়ে পরেরদিন বেরোতে। স্বামীজী সম্মত হলেন, রাত্রে মন্দির সংলগ্ন ঘরে তিনি শুয়ে পড়লেন।

শেষরাত্রিতে তিনি শয্যা ত্যাগ করে বেরিয়ে পড়লেন বিগ্রহের সব অলংকার ঝোলায় পুরে এবং প্রাণপণে ছুটতে আরম্ভ করলেন। এদিকে সকালে মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত করে পুরোহিতের মাথায় হাত, বিগ্রহের সমস্ত গয়না লোপাট। সঙ্গে সঙ্গে সেই ভূস্বামীর কাছে গিয়ে আনুপূর্বিক সমস্ত কথা জানালেন। সমস্ত ঘটনা জেনে ভূস্বামীটি নিজের লেঠেলদের পাঠালেন স্বামীজীকে খুঁজতে।

BANGLADARSHAN.COM

এদিকে স্বামীজী বেশ কিছুক্ষন দৌড়ে বেশ কিছুদূর গিয়ে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন। এটা তিনি কি করলেন? তিনি নির্লোভ নৈয়ায়িক সন্ন্যাসী হয়ে শেষে কিনা চুরি করে পালাচ্ছেন? কেন চুরি করলেন তিনি? যেই তাঁর এই চিন্তা মনে এলো তিনি উল্টোপায়ে সেই গ্রামের দিকে চলতে লাগলেন নানা চিন্তায় চিন্তিত হয়ে। ফলে গ্রামের সেই লেঠেলদের হাতে পড়লেন তিনি, তারা তাঁকে বেঁধে টেনে নিয়ে চলল। একসময় তিনি আবার সেই গ্রামে এসে উপস্থিত হলেন, গ্রামের লোক, সেই পুরোহিত এবং ভূস্বামীটি তাঁকে পেয়েই তাঁর কঠিন শাস্তির কথা বললেন।

এবার অমলানন্দ স্বামী ভূস্বামীকে বললেন, “আমি নিশ্চয় শাস্তি গ্রহণ করব, কিন্তু তার আগে আমার একটা জিজ্ঞাসা আছে। আমায় আপনি কাল যে যে দ্রব্য সমূহ আহারের নিমিত্ত দিয়েছিলেন, সেগুলো কি আপনার ভূস্বামী বললেন, “না, সেগুলো মন্দিরে জনৈক গ্রামবাসী পুজো দিয়েছিলেন, তার দেওয়া সেই দ্রব্যই আপনাকে দেওয়া হয়েছে। কেন বলুনতো?”

অমলানন্দ স্বামী বললেন, “তাঁকে কি একবার ডাকা যাবে?”

স্বামীজীর অনুরোধে পুরোহিত তাকে ভীড়ের ভেতরে চিহ্নিত করলে সে নিজেই এগিয়ে এলো। তার ছেলের কঠিন অসুখ সেরে গেছে বলে সে ওই দ্রব্যগুলি দিয়ে মানসিক শোধের পুজো দিয়েছিল।

BANGLADARSHAN.COM

স্বামীজী তাকে জিজ্ঞেস করলেন, “আপনার বৃত্তিটি কি জানতে পারি?”

সে কিছু উত্তর দেবার আগে গ্রামের লোক বলে দিল যে চুরি করাই তার পেশা, এবারে স্বামীজী তাকে জিজ্ঞেস করলেন, “আপনি ওই সব পুজোয় দেওয়া মানসিকের দ্রব্য কোথা থেকে কিনেছিলেন?”

সে জানাল সে গ্রামের একটি দোকান থেকে কিনেছে, সেই দোকানদারও সেখানে উপস্থিত ছিল, পরিস্থিতি ঘোরালো দেখে সে নিজেই জানালো যে তার কাছে ওই সব দ্রব্যাদি বিক্রয় করে টাকা নিয়েছিল যে সে ওই এলাকায় চুরির জন্য কুখ্যাত।

এবার স্বামীজী সেই ভূস্বামীর পদতলে সব গয়না রেখে বলল, “আমি চুরি করেছি, অত্যন্ত অন্যায় কাজ, আমার অপরাধ শাস্তিযোগ্য সন্দেহ নেই। কিন্তু আমাকে অশুদ্ধ অন্ন খেতে অনুরোধ করে খাইয়েছেন আপনি আর পুরোহিতমশাই যার ফলে আমি এই ঘৃণ্য কাজে লিপ্ত হয়েছি। তাই চুরি করে পালিয়ে বেশ কিছুদূর গিয়ে আমার মনে হল আমি এই কাজ করলাম কেন? আমার এতো বছরের সাধনা এবং নিষ্ঠা ওই একবেলার আহারের ফলে নষ্ট হয়ে গেল, আমাকে আবার নতুন করে শুরু করতে হবে সব। অসৎ উপায়ে অর্জিত ধন থেকে যে অন্ন আসে, তা অশুদ্ধ হয়, তাই তা মনে অসৎ চিন্তার প্রকোপ ঘটায় এবং অসৎ কাজে প্রবৃত্ত করায়। আপনি যা শাস্তি দেবেন সেই শাস্তি ভোগ করে আমায় পুনরায় বৃন্দাবনে ফিরে গিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করে আবার নতুন করে সাধন করে এগোতে হবে, একবেলার অশুদ্ধ আহার আমাকে এতগুলো বছর পিছিয়ে দিল আবার।” এই বলে তিনি হাত জোড় করে শাস্তির অপেক্ষা করতে লাগলেন। ভূস্বামীটি স্বামীজীর কথার গভীরতা অনুভব

করে দেখলেন যে তিনিও অজ্ঞাতে এই ঘটনার জন্য দায়ী। তিনি স্বামীজীর কাছে ক্ষমা চেয়ে তাঁকে চলে যেতে বললেন। স্বামীজী পুনরায় তাঁর ঝুলিটি নিয়ে চলতে আরম্ভ করলেন, এবারে তাঁর গন্তব্য বৃন্দাবন যেখান থেকে তিনি এসেছিলেন। তাই শাস্ত্র বলে, “য্যায়সা ভোজন ব্যয়সা সৃজন।”

BANGLADARSHAN.COM

॥আলো বনাম অন্ধকার॥

(মহাভারতের গল্প)

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ একদিন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে নিপুণ হাতে সাজাচ্ছিলেন। তিনি মাথায় বিভিন্ন ধরণের মুকুট দিয়ে এবং সেই মুকুটগুলিতেও আবার বিভিন্ন রত্ন শোভিত করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছিলেন আয়নায় নিজেকে কোনটাতে তাঁকে বেশি মানাচ্ছে। তাঁর সারথি এই সময় বাইরে তাঁর রথটি নিয়ে অপেক্ষমান। বহুক্ষণ অপেক্ষা করে করে সে অধৈর্য হয়ে আপনমনেই ভাবছে যে সাধারণতঃ শ্রীকৃষ্ণতো সঙ্গে সঙ্গে চলে আসেন, আজ এখনো এলেন না কেন।

আর ধৈর্য রাখতে না পেরে সে ভেতরে গেল আর দেখল শ্রীকৃষ্ণ আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের আভূষণ শোভিত মনোহর রূপ দেখে নিজেতেই নিজে মোহিত হয়ে নিরীক্ষণ করে চলেছেন।

সারথি বিনম্র কণ্ঠে কোমল স্বরে জিজ্ঞেস করল, “প্রভু, আপনি আজ এত সাজসজ্জা করছেন কেন? আজকে আমরা কোথায় যাচ্ছি?”

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উত্তর দিলেন, “আজ আমি দুর্যোধনের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি হে।”

BANGLADARSHAN.COM

সারথি খুবই বিস্মিত হয়ে বলল, “আপনি এত সাজসজ্জা করছেন শুধুমাত্র দুর্যোধনের সঙ্গে দেখা করতে যাবেন বলে?”

তখন শ্রীকৃষ্ণ বললেন, “সে আমার অন্তর্লোক দেখতে জানে না, সে আমার বাহ্যিক রূপকেই চেনে এবং বাহ্যিক রূপেরই সে গুণগ্রাহী। তাই আমি সুসজ্জিত হয়ে যাচ্ছি তাকে প্রভাবিত করতে।”

শুনে সারথি বলল ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে, “আপনি দুর্যোধনের কাছে যাচ্ছেন? আপনার যাওয়া উচিৎ নয়, তারই আপনার কাছে আসা প্রয়োজন। আপনি যে ত্রিভুবনের স্বামী।”

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সারথির দিকে চেয়ে মধুর হেসে বললেন, “অন্ধকার আলোর কাছে আসে না, আলোকেই অন্ধকারের কাছে যেতে হয় আঁধার কাটিয়ে আলোকিত করতে। অন্তর আলোকিত নাহলে যে অজ্ঞানের আঁধার কাটেনা, দেখি যদি তার অন্তরের অজ্ঞানের তিমির আমার দিব্যজ্যোতির পরশে, আমার সৎ সান্নিধ্যে এসে আলোকিত হয়!!!”

তথ্যসূত্র: মহাভারত

॥সত্য বাস্তবের চেয়েও অবিশ্বাস্য॥

প্রায় দশ বছর আগের কথা। মেয়ে তখন ক্লাস সিক্স, একটি মিশনারি কনভেন্ট স্কুলে পড়ে, ওদের স্কুলে কেরিয়ার কাউন্সেলিং এর জন্যে ওদের অধ্যক্ষার সহপাঠী বর্তমানে নাসার প্যারাসাইকোলজি বিভাগের একজন গবেষক এলেন ওদের স্কুলে ওদের কেরিয়ার কাউন্সেল করতে। ক্লাস সিক্স থেকে এইট দুটো করে সেকশন, সবাই একে একে গেল ওঁর কাছে। ভদ্রমহিলার নাম ডঃ সুষমা ত্রিবেদী।

মেয়ে বাড়ি এসে বলল যে ওই ভদ্রমহিলার ওকে খুব পছন্দ হয়েছে, কারণ সবাই তাদের কিরকম বিয়ে হবে, ভবিষ্যৎ জীবনে কার বর কেমন হবে, তাদের ভবিষ্যতের সাংসারিক জীবন কেমন হবে এইসব জিজ্ঞাসা করেছে, উনি অসন্তুষ্ট হলেও বলেছেন। মেয়ে ওঁকে ওঁর ওই প্যারা সাইকোলজি বিষয়ে জিজ্ঞেস করেছে, কিভাবে উনি এই লাইনে এলেন জানতে চেয়েছে। ভদ্রমহিলা ওকে আলাদা সময় দিয়ে ওই স্কুলে বসে আমাদের বাড়ি, তার বাসিন্দা, বাড়ির পারিপার্শ্বিক বাতাবরণ, বাড়ির লোকেদের আচরণ, আমার আর মেয়ের বাবার কথা বলার সাথে সাথে বলেছেন যে আমাদের বাড়ি সংলগ্ন পুকুরে একটি বাচ্চা ছেলে ডুবে মারা যায় বেশ কিছু বছর আগে, এবং তারপরে আস্তে আস্তে পুকুরটা বুজে যেতে থাকে। এই তথ্য আমারো তখন জানা ছিল না, মেয়ের বাবা আর মেয়ের ঠাকুমা দুজনেই জানান যে এই তথ্য সঠিক। আমি স্বভাবতই খুব বিস্মিত হয়েছিলাম ওই সুষমাদেবীর অদ্ভুত ক্ষমতা দেখে। পর পর চার বছর উনি এলেন, এবং মেয়েকে অনেক কথার সঙ্গে এটাও বলে গেলেন ও যেন হঠাৎ করে কোনো কিছু কাউকেই না দেয়। এরপর শেষে এলেন মেয়ের ক্লাস নাইন যখন। আমরা তখন গুরু কৃপা পাবো কিনা এই নিয়ে দোলাচলে। উনি মেয়েকে বলে গেলেন যে অসাধারণ শক্তিধর সদ্গুরু লাভ আমাদের হয়ে গেছে, এবং সদ্গুরু আমাদের স্বয়ং পরমাপ্রকৃতির রূপ যিনি আমাদের অনন্ত কৃপা করেছেন, যিনি আমাদেরকে নিজের অন্তরঙ্গ পার্ষদ হিসেবেই স্নেহ করেন। আমরা সুষমাদেবীর সঙ্গে দেখা করতে খুবই আগ্রহী ছিলাম, উনিও দেখা করবেন বলেছিলেন এবং মেয়ের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবার জন্যে ওঁর ব্যক্তিগত ইমেল মেয়েকে দিয়ে যান। তারপরে উনি আর কলকাতায় আসেননি।

BANGLADARSHAN.COM

আমার মেয়ে একটু অন্যরকম ছোট থেকেই। কোনো জায়গার বা মানুষের খারাপ কিছু থাকলে ওর অনুভূতিতে চট করে ধরা পড়ে সেটা। তা ছাড়া কোনো দুর্ঘটনা ঘটবার আগের মুহূর্তে হঠাৎ ওর চোখের সামনে সেটা ভেসে ওঠে। যেমন একবার ও হঠাৎ দেখে যে ঠিক ওদের স্কুলের সামনে দুটো গাড়ির মুখোমুখি ধাক্কা লাগল, সেদিনই ওর চোখের সামনে ওদের স্কুলে এই এক্সিডেন্টটা ঘটল। আরেকবার ও দেখে আগেরদিন রাত্রে যে ও সিঁড়ি থেকে পড়ে যাচ্ছে, পরেরদিন স্কুলের সিঁড়ি থেকে ও সত্যি সত্যিই পড়ে যায়। কলেজে পড়ার সময় একদিন হঠাৎ দেখল যে কলেজের ক্লাসরুমের পাখাটা খুলে পড়ছে, পরেরদিন কলেজে গিয়ে শোনে সত্যিই ওদের ক্লাসরুমের পাখা খুলে পড়েছে ক্লাস চলাকালীন এবং তাতে বেশ কয়েকজন আহত হয়েছে। এইরকম বহু ঘটনা ওর জীবনে ঘটেছে। সবচেয়ে খারাপ ব্যাপার হল ও যেগুলো দেখে সেগুলো ঘটে আর ও আটকাতে

পারে না বলে খুব মনখারাপে ভোগে। এছাড়া ওর occult science, witch craft, প্যারা সাইকোলজি, metaphysics নিয়ে ভীষণ কৌতূহল, এই বিষয়গুলোর ওপরে রীতিমত বইপত্র পড়ে ও জানতে চেষ্টা করে। এটা এক্সট্রা সেন্সরি পার্সেপশন (extra sensory perception) বলে প্যারাসাইকোলজির ভাষায়।

আমার মেয়ে, দীপু এবং আরো কয়েকজন মিলে একটা ব্যান্ড করেছিল, যেখানে মহিলা মুখ্য গায়িকা ও সঙ্গীতায়োজক হিসেবে ছিল আমার মেয়ে আর দীপু ছিল মুখ্যপুরুষ গায়ক এবং যেহেতু ও অনেকগুলো যন্ত্র বাজাতে পারে, তাই ব্যান্ডের একজন প্রধান কর্ণধার। প্রসঙ্গত বলে রাখা দরকার যে দীপু বাবা মায়ের দুর্ব্যবহারে জেরবার হয়ে আলাদা একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকে আর স্কুলের টাকা ও নিজের খরচ চালানোর জন্যে একটা স্কুলে বেহালা বাজানো শেখায়। একদিন সন্ধ্যেবেলায় মেয়ের বন্ধু দীপু মেয়েকে ভিডিও কল করে কথা বলছে, মেয়ে দেখলাম আমাকে এসে জিজ্ঞেস করল যে শেষ দুমাস দীপু নাকি ঘুমের মধ্যে দেখছে যে একজন ওকে খুব মারছে আর সকালে উঠে দেখছে যে যে জায়গায় মারছে দেখেছে, সেই সেই জায়গায় কালশিটে পড়ে আছে, শেষ দুমাস ও ঠিকমত ঘুমোতে পারেনি রাত্রে। কি করবে বুঝতে পারছে না, আমি কোনো সমাধান দিতে পারব কিনা। যেদিন এসে কথাটা জিজ্ঞেস করল, সেদিন বৃহস্পতিবার ছিল, আমাদের বেহালা অঞ্চলের সব দোকান সেদিন বন্ধ থাকে। আমার কোনো কিছু মাথায় এলো না, আমি বললাম যে মাথার বালিশে শোয়ার আগে দুর্গানাম লিখে শুতে আর পারলে একটা ঘোড়ার নাল বালিশের তলায় নিয়ে শুতে। যাই হোক, মেয়ে ওকে আমার কথা বলে আর বলে যে ও যেহেতু মা কালীর পুজো করে, ও যেন মায়ের ধূপের ছাই কপালে লাগিয়ে শোয়। দীপু বালিশে দুর্গানাম লিখে ধূপের ছাই কপালে লাগিয়ে সেদিন শুলো। সেদিন রাত্রি থেকে আর কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু মেয়ের হঠাৎ শরীর খারাপ হল।

BANGLADARSHAN.COM

শনিবার রাত্রে আমার মেয়েকে সুষমা দেবী জিজ্ঞেস করলেন যে এর মধ্যে ও কোনো কিছু করেছে কিনা কারণ সুষমা দেবী জানতে পেরেছেন যে ধূপটা দীপু ব্যবহার করেছে সেটা আমার মেয়ের স্পর্শ করা, আর যে দীপুকে স্বপ্নে মারছিল, সেটি এক অতৃপ্ত আত্মা যাকে কুড়ি বছর আগে মেরে দীপুর বাবা মাটিতে পুঁতে দিয়েছিল, যার ফলে তার পারলৌকিক কাজও হয়নি আর আত্মার মুক্তি হয়নি। সে খাতায় কলমে নিখোঁজ কিন্তু আসলে মৃত এবং অতৃপ্ত আত্মা। সে দীপুর বাবার ওপরে প্রতিশোধ নিতে গেছিল, কিন্তু দীপুর বাবা জনৈক তান্ত্রিককে দিয়ে ক্রিয়া কর্ম করিয়ে আগেই ওর নাগালের বাইরে চলে গেছে, তাই প্রতিশোধটা এবার দীপুর ওপরে নেবে। আমার মেয়ের স্পর্শ করা ধূপ দীপু না জেনে ব্যবহার করেছে, তাই পুরো আক্রমণ আমার মেয়ের ওপরে হবে। মেয়ে যেন আগে গিয়ে মা কালীর কাছে এই অজ্ঞাতে অন্যায়ের জন্যে ক্ষমা চেয়ে আসে আর এই জ্বর আর শরীর খারাপের কারণ মেয়ের জীবনীশক্তি থেকে ওই ধূপের মাধ্যমে দীপুর মধ্যে তা চলে গেছে, যার ফলে দীপু বেঁচেছে সাময়িক। দীপুকে আস্তে আস্তে মেরে ফেলবে, হঠাৎ একদিন দেখা যাবে যে দীপু মারা গেছে। আমার তো শুনে মাথায় হাত, কি ভাবে এই চক্র থেকে মেয়েকে বার করব।

ছুটলাম আমার গুরুমায়ের কাছে। উনি প্রথমে প্রচুর বকাবকি করলেন, তারপর বললেন যে এই আত্মা মুক্তি চাইছে, তাই মায়ের কাছে আসার রাস্তা খুঁজছে, কিন্তু মায়ের স্তরের কাছে আসার জন্যে মেয়েকে মাধ্যম করেছে। দীপু যেন আগে গিয়ে কালীঘাটে ওই আত্মার পারলৌকিক কাজ করে পিন্ডদান করে। বাড়ি এসে মেয়েকে বলতে, ও দীপুর সঙ্গে যোগাযোগ করে জানাল। দীপু তারপরের সোমবার গিয়ে প্রায় সাত হাজার টাকা খরচা করে ওই আত্মার শ্রাদ্ধ আর পিন্ডদান করে এলো। তার পরে পরেই মেয়ের স্বপ্নে ওই আত্মা এসে মেয়েকে হাতজোড় করে ধন্যবাদ জানিয়ে গেল। এবার মেয়ে তো সেই লোককে চেনেনা, মেয়ে তাই অবাক হয়ে আমাকে যখন বললো যে একজন ওকে স্বপ্নে এসে ধন্যবাদ জানিয়ে গেছে আমি ওকে দীপুকে জিজ্ঞেস করতে বললাম চেহারার বর্ণনা দিয়ে। দীপু মেয়ের বর্ণনা শুনেই বললো যে একদম সেই লোক। গুরুমা মেয়েকে বারণ করে দিলেন যে ও যেন এখন দীপুর বাড়ি না যায় আর কোনো তান্ত্রিকের কথা না শোনে কারণ ও যেহেতু উন্নত আধার, ওকে খুব সহজেই তান্ত্রিকরা বিপদে ফেলতে পারে। অদ্ভুত ব্যাপার, তার কিছুদিন পরেই দীপু মেয়েকে বলল যে একজন তান্ত্রিক ওই বাড়িতে এসে বলেছেন যে ওখানে অতৃপ্ত আত্মা ছিল, কিন্তু একটি উন্নত আধার মেয়ের জন্য সে মুক্ত হয়ে গেছে, সেই তান্ত্রিক তাই মেয়েকে দেখে কথা বলতে চেয়েছে কিন্তু দীপু তাকে বলে দিয়েছে যে সেই মেয়ে এখানে নেই।

BANGLADARSHAN.COM

শ্রীমতী সুষমা ত্রিবেদী

॥অনন্তের ডাক॥

পুণ্যতোয়া এবং দিব্যজ্যোতির্ময়ী মা নর্মদার কথা ও মাহাত্ম্য প্রথম কীর্তিত হয় ঋষি মার্কণ্ডেয়ের ভাবনায় যা মার্কণ্ডেয় পুরাণে বর্ণিত হয়। ঋষি মার্কণ্ডেয় হলেন সেই মহাত্মা যাঁর লিখিত শ্রীশ্রীচণ্ডী আমাদের দেবীপূজার প্রধান মন্ত্র ও স্তব। আম বাঙ্গালী নর্মদা মাহাত্ম্য জানতে পারেন শ্রীশৈলেন্দ্রনারায়ণ ঘোষাল শাস্ত্রীর আট খণ্ডের নর্মদা পরিক্রমার কাহিনী তপোভূমি নর্মদা পড়ে। যে সপ্তনদীর আবাহন আমরা করি যে কোনো পুজোতে বসে জল শুদ্ধির সময়,

‘ওঁম গঙ্গে চ যমুনা চৈব গোদাবরী সরস্বতী,
নর্মদে সিন্ধু কাবেরী জলেস্মিন সন্নিধিঙ কুরু’

মন্ত্রোচ্চারণ করে সেই সাতটা নদীর মধ্যে অন্যতম নর্মদা। মা নর্মদার মাহাত্ম্য কীর্তনে বাবা লোকনাথ এক জায়গায় বলেছেন যে একদিন তিনি দেখলেন একটি কালো মলিন গাভী এসে নর্মদার জলে স্নান করতে নামল এবং যখন উঠল দেখা গেল গাভীটির ধবধবে সাদা রং, ঋষিবর ধ্যান দৃষ্টিতে দেখলেন ওই গাভীটি আসলে মা গঙ্গা যাঁর সর্ব অঙ্গ সকলের কলুষ মোচন করে করে কালো মালিন্যময় হয়ে গেছিল, যিনি নর্মদায় অবগাহন করে কলুষমুক্ত হলেন।

BANGLADARSHAN.COM

আমার মাসতুতো দেওর বাবুদা, ভালো নাম শ্রীমান সুব্রত মুখার্জী। বয়সে আমার চেয়ে বড়ো, কিন্তু সম্পর্কটা আমার সঙ্গে আন্তরিক, নিজের ছোট দেওরের চেয়ে বাবুদা আমার অনেক কাছের।

বিয়ের পরে আমার স্বামীর পরে অবশ্যই বাবুদা আমার শ্বশুরবাড়ির একমাত্র লোক যার কাছে আমি অকপটে আমার মনোভাব ব্যক্ত করতে পারতাম। বিয়ের প্রথম বছরে বিশ্বকর্মা পুজোর দিন অফিস থেকে বাড়িতে ফিরে দেখি হৈ হৈ ব্যাপার। আমার ছোট দেওর, যাকে ছোড়দা বলি, সে পেশায় সিভিল ইঞ্জিনিয়ার। সেদিন সে লোকজন নিমন্ত্রণ করেছে তার অফিসে চাউমিন, চিলি চিকেন আনুষাঙ্গিক পানীয়ের সঙ্গে খাওয়াবে বলে, আমি সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে দেখলাম শাশুড়ি মা পেঁয়াজ কাটছেন বসে, বাবুদা রান্নাঘরে কি খুটখাট করছে, আমার আসার শব্দ পেয়ে বেরিয়ে এসে বলল চা করে নিয়ে রান্নাঘরে যেতে, আমি সেইমতো গিয়ে দেখি বাবুদা সাত প্যাকেট চাউ সেদ্ধ করেছে, কেজি তিনেক চিকেন পিস করে রাখা রয়েছে, এবার সেগুলো তৈরী করার জন্য আমাকে বলল সাহায্য করতে, আমি চা টা শেষ করে সবে সেই আনাজগুলো কাটতে আরম্ভ করেছি, বাবুদা ‘আসছি’ বলে হাওয়া। তখন সন্ধে সাড়ে সাতটা, আমি চাউমিন চিলি চিকেন তার আগে বানিয়েছি, কিন্তু এইরকম পরিমাণে ‘নৈব নৈব চ।’

আমি আস্তে আস্তে সব জোগাড় করে নিয়ে যখন রান্না করছি, আমার কর্তা এসে আমাকে ওই অকুল পাথারে পড়া অবস্থায় আবিষ্কার করল, ও সব শুনে বলল, “খাবার সময়ের আগে আর বাবু এসেছে!!!!” এদিকে নটা বাজতেই ছোড়দা এসে তাড়া দিল সবাই এসে গেছে, তখনো ছোড়দার বিয়ে হয়নি, আমার ততোক্ষণে রান্না

সারা, আমি যা যা হয়েছে নিয়ে যেতে বললাম। নিয়ে গেল আমার কর্তা আর ছোড়দা মিলে কিন্তু অধিক পানীয় গ্রহণের কারণে কেউই তেমন খেতে পারল না।

বাবুদা এলো রাত সাড়ে এগারোটায়, অত খাবার পড়ে আছে দেখে আমায় বলল ফ্রিজে তুলে দিতে এবং সাতদিন ধরে চারজনে, আমি, আমার কর্তা, ছোড়দা আর বাবুদা মিলে সেই চাউমিন আর চিলি চিকেন খেয়ে তবুও রয়ে গেছে দেখে আমার শ্বশুরমশাই তো বাবুদা আর ছোড়দাকে খুব বকুনি দিলেন, শাশুড়ি মাও ওদের দুজনকে যাচ্ছেতাই বললেন আমাকে ঐভাবে বিনা নোটিসে ঝামেলায় ফেলার জন্য। আমরা তারপর বছর দুয়েক আর চাউমিন, চিলি চিকেন খাইনি। কিন্তু অতো কিছুর পরেও আজও ওই ঘটনার কথা উঠলেই আমরা খুব মজা পাই আর ওই ঘটনার ফলশ্রুতি বাবুদা সব আত্মীয় মহলে, পাড়াতে সবার কাছে আমার খুব সুখ্যাতি করে দিল। আমি একরকম আদর্শ বৌয়ের তকমা পেয়ে গেলাম বাবুদার কল্যাণে।

অদ্ভুত বৈপরীত্যে ভরা এই অকৃতদার বাবুদার জীবন, পড়াশোনায় যথেষ্ট ভালো হওয়া সত্ত্বেও বাবুদা গ্রাজুয়েশন শেষ করল না, সেই সময়েই বাবুদা বক্রেশ্বর গিয়ে গুরুর কাছে দীক্ষিত হয়ে সন্ন্যাসী হয়ে কালো বস্ত্র পরে সাত বছর কাটাল, তারপরে হঠাৎ সব ছেড়ে দিয়ে বাড়ি ফিরে এল। এসে কিছুদিন ব্যবসা করল, কিছুদিন চাকরিও করল। মাঝে মাঝেই বিভিন্ন জায়গায় বেড়াতে বেড়িয়ে পড়ত, খারাপ ভালো সব রকমের জায়গায় বাবুদার অবাধ যাতায়াত ছিল। ফিরে এসে গল্প করত সেসব আমাদের সাথে, একটা সহজ সখ্যতা আছে আমাদের সঙ্গে বাবুদার।

BANGLADARSHAN.COM

আমার মেয়ের এক বছরের জন্মদিনে শ্বশুর বাড়িতে বেশ অশান্তি হয়, এদিকে সেই বছর আলাদা বাড়ি ভাড়া করে বড়ো করে জন্মদিন করা হয়েছিল মেয়ের, অফিসের প্রচুর লোকজন বলা হয়েছিল। বাড়ির সকলে অসহযোগিতা করলেও বাবুদা কিন্তু আমার আর আমার কর্তার সঙ্গে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ছিল এবং সবরকম সাহায্য করেছে। আমার মেয়েকে বাবুদা খুব ভালোবাসে, ছোটবেলায় প্রতি পুজোয় ওকে নতুন জামা দিত, পুজোর একদিন আমি মেয়েকে সাজিয়ে দিলে সঙ্গে নিয়ে বেরোত।

তারপরে হঠাৎ একদিন শুনলাম বাবুদা আবু ধাবিতে গিয়ে চাকরি করছে ওর মায়ের দেখাশোনার জন্য, যখন আসত আমাদের সাথে দেখা করে যেত, টুকটাক ইমপোর্টেড জিনিস উপহার হিসেবে দিত। অনেক গল্প করত আমাদের সঙ্গে, ওর আধ্যাত্মিক দিকটা আমায় খুব টানত। আবু ধাবিতে শরীর খারাপ হয়ে হার্টের সমস্যা শুরু হল ওর, তিনটে স্টেন্ট বসল ওর বুকে। শুনে খুব মনখারাপ হয়েছিল। ফিরে এল ওখান থেকে, এসে একটা কোন কনস্ট্রাকশন সাইটে চাকরি নিল। মাঝে মাঝে আসলে পাড়ায় দেখা হত, আত্মীয় পরিচিতের কোনো অনুষ্ঠানে গেলে দেখা হত, তখন আবার গল্প জুড়ে দিত। পাড়ায় কখনো রিক্সায় যেতে যেতে হাত নেড়ে যেত, কখনো রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা বলত। সবচেয়ে বড়ো কথা, বাবুদা যখন কথা বলে মনে হয়না একবারও যে দীর্ঘদিন পরে ওর সাথে কথা হচ্ছে, একটা আদ্যন্ত সহজ আন্তরিকতা আছে ওর ব্যবহারে।

বাবুদার আরেকটা গুণ না বললে বাবুদার কথা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে, সেটা হল ওর জ্যোতিষচর্চা। আমার শ্বশুরমশাই খুবই ভালো জ্যোতিষী ছিলেন, আমার বড়ো ভাসুরও জ্যোতিষ চর্চা করেন, আমার কর্তাও খুব অনায়াসে অনেক কিছু বলতে পারেন তাঁর অসাধারণ পর্যবেক্ষণ শক্তির জন্য, আমি নিজেও একটু একটু বুঝি ব্যাপারটা কারণ এ বিদ্যেটা আমায় একটু শিখিয়ে গেছেন আমার শ্বশুরমশাই। কিন্তু বাবুদা জন্মসময়, স্থান জেনে কোষ্ঠী করে তার দারুণ বিচার করে। আমি যখনি প্রয়োজন হয় বাবুদাকে গিয়ে ধরি, ও ঠিক বলে দেয়।

এহেন বাবুদার অনেকদিন কোনো খবর পাই না, আমার কর্তাকে জিজ্ঞেস করলে সেও বলতে পারেনা। করোনার আবহে কেউই বাড়ি থেকে বেশি বেরোচ্ছে না, তাই কারুর কোনো খবর পাচ্ছি না। হঠাৎ আজ সকালে আমাকে এসে আমার কর্তা বলল, “কার সঙ্গে কথা হয়েছে জানো আজ? বাবুর সঙ্গে।” আমি উৎসুক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, “ভালো আছে তো?” বলল, “হ্যাঁ, ভালো আছে, ও এখন নর্মদা পরিক্রমায় চলে গেছে। ফিরবে ২০২৪-এ।” শুনেই আমি লাফিয়ে উঠেছি, কারণ জীবনে যে কটা জায়গায় যাবার ইচ্ছে আমার আছে তার একটা ওই নর্মদার তটে। আমি বললাম, “দেখ, মা নর্মদা ওকে টেনেছে, তাই যেতে পেরেছে।” আমার কর্তা আমাকে বাবুদার এরণ্ড সঙ্গম, কমণ্ডলু সঙ্গম, কিছু নর্মদাতীরস্থ সাধকদের আর কপিল ধারার ছবি দেখাল। একদম একবস্ত্রে একটা কম্বল, একসেট জামা নিয়ে কপর্দকশূন্য হয়ে বাবুদা পরিক্রমায় বেরিয়েছে, এখন ওর আটান্ন বছর বয়স, বুকে তিনটে স্টেন্ট বসানো আছে হার্টের সমস্যার জন্য, রোজ দশ বারো কিলোমিটার করে হাঁটছে নর্মদার দক্ষিণ তট ধরে। মাঝে মাঝ ছবি পাঠাচ্ছে। বাবুদাকে ফোন করল আমার কর্তা, আমিও কথা বললাম এবং বাবুদাকে বললাম, “তোমার চোখ দিয়ে আমিও দেখব।” শুনে বাবুদা আমাকে আশ্বস্ত করল।

BANGLADARSHAN.COM

সেই মা নর্মদা পরিক্রমায় বাবুদা গেছে মানে আমি বুঝলাম বাবুদাকে মা নর্মদা ডাক দিয়েছেন, ওর কাছে অনন্তের আহ্বান এসে পৌঁছেছে। আগামী চার পাঁচ বছর বাবুদার লাগদে এই পরিক্রমা শেষ করতে। জীবন থেকে মহাজীবনে উন্নীত হবার সোপান ওর তৈরী হচ্ছে। আমি খুব উচ্ছ্বসিত এই কারণে যে আমার খুব নিজের জন এই পথটা বেছেছে সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছায়। ওর সার্বিক কুশল এবং এই পথে ঈশ্বরের কৃপায় ওর পূর্ণ সফলতা কামনা করছি আমরা সপরিবারে। আমার কর্তা একটা কথা খুব বলেন যে জীবন যেন গতানুগতিক না হয়, জীবনে বৈচিত্র্য না থাকলে বেঁচে থাকার আনন্দ নষ্ট হয়ে যায়, জীবন ছোট হোক কিন্তু বৈচিত্র্যপূর্ণ হোক। বাবুদার ক্ষেত্রে ও যে এই বাঁধাগতের বাইরে একটা জীবন বেছেছে তার জন্যই ওকে সাধুবাদ জানাই। আর নর্মদার কৃপা না হলে ওই পরিক্রমায় যাওয়া হয় না। এই দীর্ঘ পরিক্রমার সময়ে মা নর্মদার অনেক লীলা ও অনেক অতীন্দ্রিয় অনুভূতি ও লাভ করবে, অনেক অদ্ভুত ঘটনা ওর জীবনে ঘটবে যা ওর বোধের জগৎকে আরো ঐশ্বর্যে ভরিয়ে দেবে। তাই অন্তর থেকে ওকে বললাম, “চরৈবেতি”।

दारितापदाचलम्।
नमामि देवी नर्मदे॥ ३॥
किरातसूतवाड़वेषु पण्डित
त्वदीयपादपङ्कजं नमामिदेवि
पठन्ति ते निरन्तरं न यान्ति
नमामि देवि नर्मदे॥ ४॥
पुनर्भवा नरा न वै विलोकयन्ति
नमामि देवि नर्मदे॥ ५॥
निवेदक :

মা নর্মদার বিগ্রহ

অমরকণ্টক নর্মদা উদ্গম

নর্মদার ধারা

নর্মদা পরিক্রমণকারী শ্রীসুব্রত মুখার্জী

॥কৃপাময়ীর দিব্যকৃপা॥

নর্মদা পরিক্রমায় চলেছে সুব্রত। বেশ ছিল বাড়িতে, স্কুলের চাকরি করে সে, দিব্যি ছিল বাঁধাগতের জীবনে, হঠাৎই তার মাথায় ঢুকল নর্মদা পরিক্রমায় যাবে, সরকারি স্কুল ছুটি দেবে না, চাকরিতে পদত্যাগ করে বেরিয়ে পড়ল। বাবা মারা গেছেন, মা থাকেন এক বোনের কাছে। নিজের জমানো সব টাকা পয়সা দিয়ে এলো বোনকে মাকে দেখাশোনা করার জন্য। নিজে যে ডেরাটা ছিল শহরের শেষে সেখানকার পাট তুলে বেরিয়ে পড়ল রঞ্জন একেবারে "রইল ঝোলা চলল ভোলা" হয়ে। সম্বল বলতে একটা কম্বল সমেত বিছানা, দুটো সেট জামাকাপড় আর কিছু নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস আর মোবাইল ফোনটা। বরাবরই সুব্রত একটু বোহেমিয়ান স্বভাবের, যখন তখন বেরিয়ে পড়েছে বাঁধাগতের জীবনে আটকে না থেকে। বিয়ে থা করেনি, তেমন পিছুটান নেই তার। করোনা শুরু হতে স্কুল সংলগ্ন কোয়াটারে ছিল কয়েক মাস, তারপরে ঠিক পুজোর মাস দেড়েক আগে এই নর্মদা পরিক্রমার ইচ্ছে প্রবল হতে বেরিয়ে পড়েছে দক্ষিণ তট ধরে। বরাবরই সাধুসঙ্গ আর সৎপ্রসঙ্গ বড়ো প্রিয় ওর।

এবারে সেই কারণে প্রথমে এলো অমরকণ্টক, সেখানে কিছুদিন থেকে পুজোর ঠিক পঞ্চমীর দিন থেকে শুরু হল ওর পথচলা মা নর্মদার নাম নিয়ে, নর্মদা মায়ের ইচ্ছে না হলে মায়ের পরিক্রমা তো দূর, মায়ের দর্শন করতেও কেউ আসতে পারে না। নর্মদা তটে নর্মদা মায়ের ইচ্ছেটাই শেষ কথা, কারণ গঙ্গা, নর্মদা প্রভৃতি নদীগুলির দুটি করে সত্তা বিদ্যমান, একটি তার জলের ধারার সত্তা আর একটি তাঁদের দিব্য কৃপাময়ী জ্যোতিরূপ সত্তা। দেখতে দেখতে পনেরো দিন হয়ে গেল ও পথ হাঁটছে, ডিন্ডোরির রামঘাট সংলগ্ন ধর্মশালাতে দিন দুয়েক এসেছে সে। ডিন্ডোরিতে মা নর্মদার বিস্তার দেখে ও মুগ্ধ, অনায়াসে একে সহস্রধারা বলা যায়। ডিন্ডোরি একটি জেলা সদর, বেশ উন্নত জায়গাটা আর সবচেয়ে মনোমুগ্ধকর এক প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। নর্মদার বিশাল বিস্তার দেখে যেন আশ মেটে না। আসার পথে কুকরামঠ আর ঋণমুক্তেশ্বর মহাদেব দর্শন করে এসেছে। কুকরামঠের একটা অদ্ভুত গল্প শুনল পথে, গল্পটা এইরকম:

BANGLADARSHAN.COM

কুকরামঠের ও ঋণ মুক্তেশ্বর মহাদেবের কথা

****

এক আদিবাসী এক মহাজনের কাছে অনেক টাকা ঋণ করেছে, কিছুতেই সে ঋণ শোধ করে উঠতে পারে না। তার এক ভীষণ প্রভুভক্ত কুকুর ছিল, মহাজন টাকা না পেয়ে সেই কুকুরটাকে চাইল যতদিন না ঋণ শোধ হয়। আদিবাসী কুকুরটা অনেক বুঝিয়ে আদর করে মহাজনকে দিয়ে দিল। কুকুরটাকে নিয়ে মহাজন চলে গেল। ঠিকই সেইদিনই রাত্রে মহাজনের বাড়িতে ডাকাতি হল, ডাকাতরা মহাজনের সব সম্পদ ডাকাতি করে নিয়ে গেল। পরের দিন সেই কুকুরটা মহাজনকে নিয়ে গিয়ে একটা জায়গা দেখায় যেখানটা খুঁড়ে মহাজন তার সব সম্পদ ফিরে পায়। সমস্ত সম্পদ ফিরে পেয়ে খুব খুশি হয়ে মহাজন কুকুরটার গলায় একটা কাগজে সেই আদিবাসীর সমস্ত ঋণ মুকুব করে ঝুলিয়ে কুকুরটিকে মুক্তি দেন, কুকুরের জন্য মালিকের ঋণ মুকুব হয়।

কুকুরটা মালিকের কাছে ফিরে আসলে সেই আদিবাসী মালিক ভাবে কুকুরটা মহাজনের কাছে থাকতে চায় না বলে ফিরে এসেছে, সে লাঠি দিয়ে কুকুরটাকে খুব মার মারে, ফলে কুকুরটা মারা যায়। এমন সময় তার নজরে পড়ে কুকুরটার গলায় ঝোলানো কাগজটা। পড়ে আসল ঘটনা জানতে পেরে সেই আদিবাসী খুবই অনুতপ্ত হয় এবং সেই অনুশোচনায় দগ্ধ হতে হতে সে শিবের তপস্যা করে, দীর্ঘ তপস্যায় শিব খুশি হয়ে তাকে সেই মহাজন ও কুকুরের কাছে তার সেই ঋণ থেকে তাকে মুক্তি দেন। সেই আদিবাসী সেই প্রভুভক্ত কুকুরের নামে প্রতিষ্ঠা করেন কুকরা মঠ যেখানে শিবের লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করে নাম দেয় ঋণ মুক্তেশ্বর মহাদেব। নর্মদা পরিক্রমাকালে দক্ষিণ তটে ডিন্ডোরি জেলায় পড়ে এই জায়গা। ঋণমুক্ত মহাদেবকে চোঙায় জল ঢেলে কুকরামঠ দেখে আবার পথে নামল সুব্রত।

এবারে জবলপুর-মান্ডালা রোড ধরে হেঁটে দেবগাঁওতে পৌঁছল সুব্রত, উঠল ওখানকার এক ধর্মশালাতে। নিজের ঝোলা রেখে নর্মদা মায়ের শীতল ধারাতে স্নান করে এসে পুজোয় বসে শুনলো এক মাতাজীর কণ্ঠস্বর। পুজো করে উঠে ঘরের বাইরে যেতে আলাপ হল মাতাজীর সঙ্গে। মাতাজীর নাম শৈলজা মোরে, মহারাষ্ট্রের লোক, বছর পঞ্চান্ন বয়স। পরিক্রমা শুরু করেছেন ওঁমকারেশ্বর থেকে জানুয়ারি মাসে, গোটা ৩২০০ কিলোমিটার পরিক্রমার আর ছশো কিলোমিটার গেলেই ওঁর পরিক্রমা শেষ হবে। পরিক্রমা করেছেন নগ্ন পদে সেমিজ পদে শাড়ি পরে একদম নর্মদার তট ধরে যে পরিক্রমা সাধু সন্তরাও এখন করেন না পথের দুর্গমতার জন্য। পথের মধ্যে সামনে দেয়াল বা পাহাড় থাকলে আগে নিজের ঝোলাটা ছুঁড়ে দিচ্ছেন ওপারে, তারপরে নিজে সেই দেয়াল বা পাহাড় বেয়ে উঠছেন।

BANGLADARSHAN.COM

এইভাবে উঠতে গিয়ে একদিন ওঁর ঘন জঙ্গলের মধ্যে পায়ে কাঁটা বিঁধে এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে যায়। উনি রক্তাক্ত অবস্থায় জঙ্গলের মধ্যে দিনের শেষে বসে পড়েন ওই আহত পা নিয়ে আর অঝোরে কাঁদতে থাকেন। নির্জন বনে একাকী ওই মাতাজীর কান্না শোনার জন্য কেউ ছিল না ধারেকাছে। হঠাৎ মাতাজী দেখেন এক বৃদ্ধা এসে ওঁর পাশে বসে ওঁর গায়ে পিঠে হাত বোলাতে থাকে, যেন ছোটো বাচ্ছাকে ভোলাচ্ছে। তারপরে মাতাজীকে বলেন ওঁর আহত পা ওই বৃদ্ধার কোলে তুলে দিতে। মাতাজী কিছুতেই রাজি হননি। তখন সেই বৃদ্ধা মাতাজীকে বলেন কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে ওই বৃদ্ধার হাতটা ধরে থাকতে, মাতাজী রাজি হন আর তাই করেন। কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে বসে চোখ খুলে দেখেন যে পায়ে ফুটে যাওয়া সেই কাঁটাটা ওঁর হাতের তালুতে, পায়ে কোনো ক্ষত আর নেই আর উনি বসে আছেন নর্মদা মায়ের কিনারায় একটা গ্রামের ধারে, সেই বৃদ্ধা অদৃশ্য। নর্মদা মায়ের দিব্যকৃপা উপলব্ধি করে মাতাজী অনেকক্ষণ কাঁদেন তারপরে হেঁটে এই দেবগাওঁতে এসে এই ধর্মশালাতে উপস্থিত হন। শুনতে শুনতে সুব্রতর গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। সুব্রতও তখন তাঁকে বলে কিভাবে সে প্রচন্ড আমাশয়তে আক্রান্ত থেকে নর্মদা মায়ের কৃপায় পথ চলতে চলতেই সুস্থ হয়েছে আর সালাইয়ায় জ্ঞানদাসবাবাজির কুঠিয়াতে অগুনতি লালপিঁপড়ে আর কাঠপিঁপড়ের মধ্যে শুয়েও, সারা রাত তারা তার গায়ে উঠলেও একবারও না কামড়ানোর ঘটনা। নর্মদা মায়ের কৃপায় নর্মদা তটে পরিক্রমাকারীদের স্থানীয় মানুষ অকুণ্ঠ সেবাভাব নিয়ে পঞ্চ ভূতের শরীরের সেবা যেচে করে, তাই তাঁদের খাবারের অভাব হয় না। সেটা সুব্রত

এই কদিনেই দেখেছে আর উপলব্ধি করেছে। শৈলজা মাতাজীর কাছে নর্মদা মায়ের এই কৃপাময়ী রূপের আরেকটা ঘটনা শুনে সুব্রত নতুন করে উপলব্ধি করে মা নর্মদার কত কৃপা তার ওপরেও বিদ্যমান। আমাদের হিন্দু শাস্ত্রমতে গঙ্গার স্নানে মোক্ষলাভ হয় আর নর্মদা মায়ের দর্শন মাত্রেণ সেই মোক্ষ লাভ হয়।

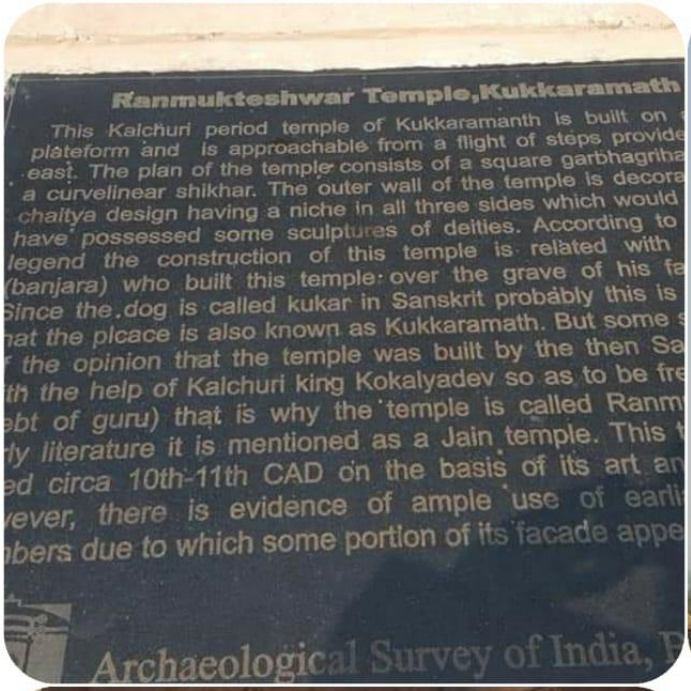

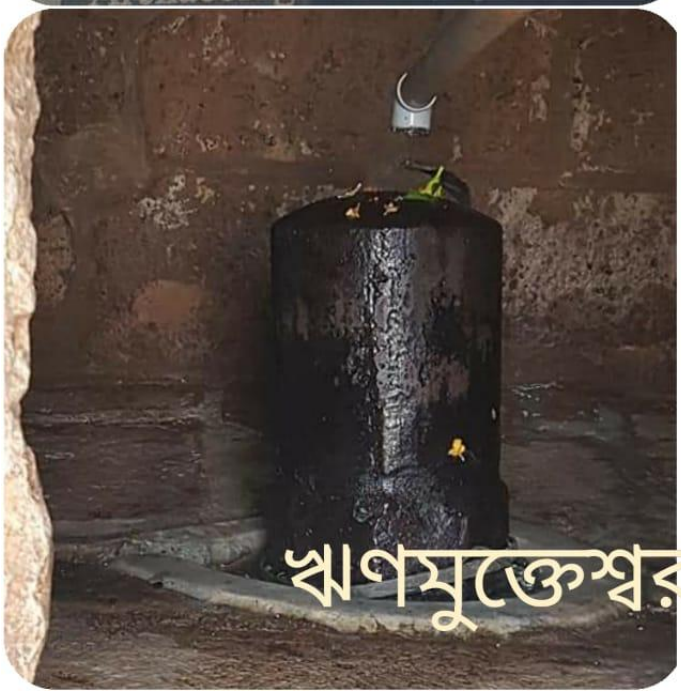

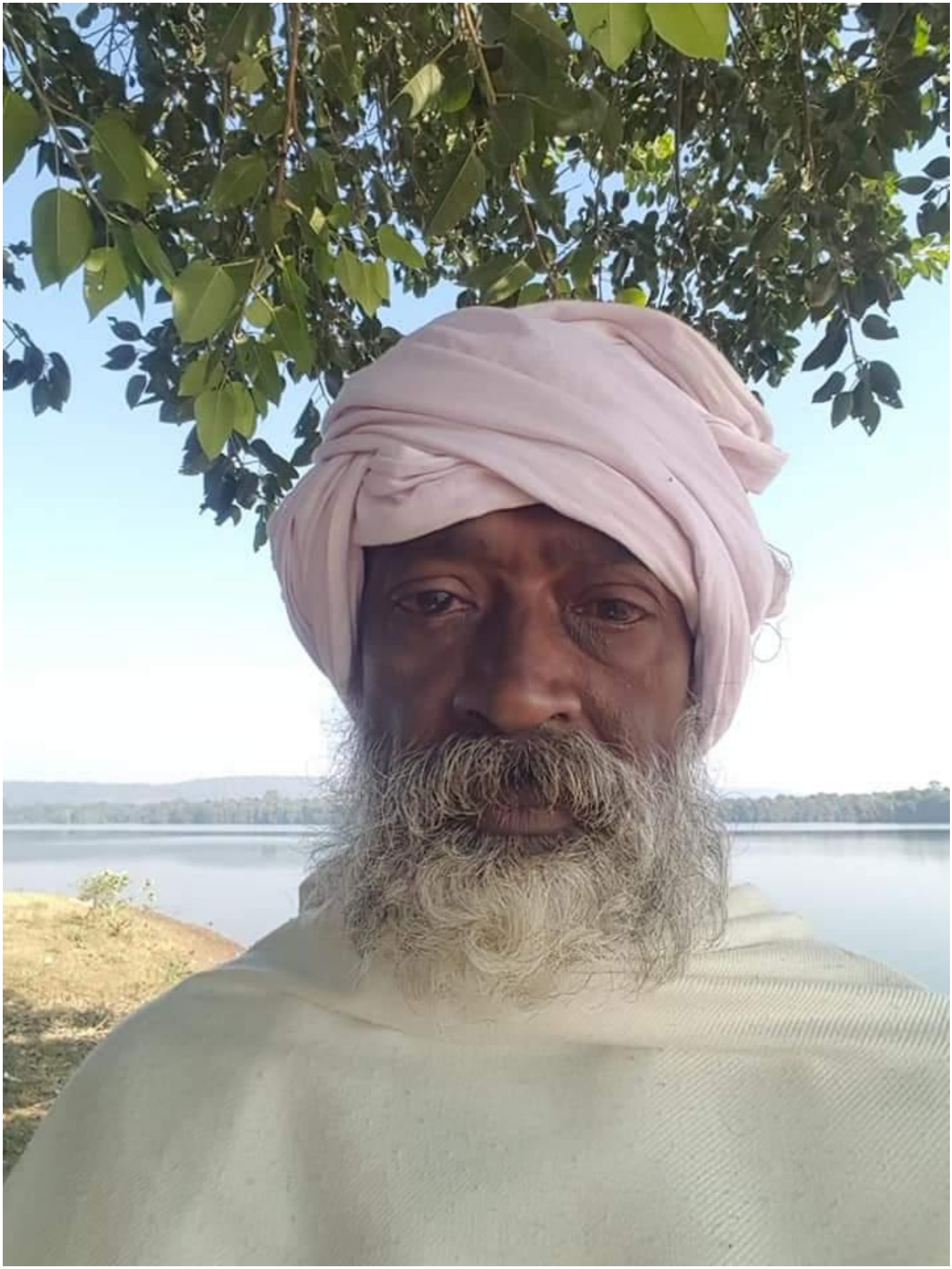

নর্মদা পরিক্রমণকারী শ্রীসুব্রত মুখার্জী

মাতাজী শৈলজা মোরে

॥সায়াহ্নের অনুভব॥

নর্মদার দক্ষিণতট ধরে হেঁটে চলেছে নর্মদা মায়ের পরিক্রমাকারী সুশান্ত। সেই সকাল নটায় স্নান পূজা সেরে বাল্যভোগের প্রসাদ পেয়ে বেরিয়েছে সে। মা নর্মদার নাম মুখে নিয়ে আর মা নর্মদার প্রতি ভক্তি বুকে নিয়ে পথ চলতে চলতে সবে বেলা তিনটের এসে সে পৌঁছল নর্মদাতট সংলগ্ন শঙ্করভারতীজীর মাধবপুরের নির্মীয়মান আশ্রমে। মধ্যপ্রদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল এই মাধবপুর। জবলপুর-অমরকণ্টক রোডের ধার ঘেঁষে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে এখানে এসে পৌঁছলে শঙ্করভারতীজী তাকে সাদরে তাঁর আশ্রমে থাকতে অনুরোধ করলেন। ভারতীজীর মতে "সেবাই পরম ধর্ম", উনি এই মতে বিশ্বাসী। মানবশরীর পঞ্চভূতে সৃষ্ট, তাই তার সেবাই পঞ্চভূতের সাধনা। সুশান্ত নর্মদার পুণ্য স্রোতে অবগাহন করে পূজা সেরে আহার গ্রহণ করল। তারপরে এসে বসল একাকী এই মা নর্মদার কোলধৌত করা ঘাটের সিঁড়িতে। কার্তিকের বেলা, বিকেল পাঁচটাতেই আস্তে আস্তে সন্ধ্যা নামছে, পশ্চিম দিগন্তে আবিরের লালিমা ছড়িয়ে পাটে বসেছেন মার্তন্ডদেব। পূর্ব দিগন্তে সদ্য গত পূর্ণিমার চাঁদের আভাস সুস্পষ্ট। ক্লান্ত বিহগকুল ফিরছে তাদের কুলায়। নদীর অপর পাড়ে একটি দুটি করে দীপের আলো দৃশ্যমান। এপারেও মন্দিরে মন্দিরে ঘণ্টাধ্বনি আর ধূপদীপের গন্ধে সন্ধ্যা সমাগমের বার্তা ঘোষিত হচ্ছে। ডিঙি নৌকোগুলো জলের স্রোতে আর বাতাসে একটু একটু করে দুলছে। ঘাট প্রায় জনশূন্য।

BANGLADARSHAN.COM

সূর্যের আলোর রেশ মুছে যেতেই জ্যোৎস্নায় প্লাবিত হল চরাচর। সুশান্ত যেন একটা ঘোরের মধ্যে চলে গেল। মন্দিরের আরতির ঘণ্টাধ্বনি আর সন্ধ্যারতির বিরতি ঘটতেই অপার নৈঃশব্দে ডুবে গেল সম্পূর্ণ বাতাবরণ। নর্মদার পুণ্যধারার কুলুকুলু ধ্বনি ব্যতীত আর কোনো শব্দ নেই কোথাও। বহুদূরের কোনো মন্দির থেকে ভেসে আসছে অস্পষ্ট স্তোত্র পাঠের আওয়াজ। হঠাৎই টি টি করে ডাকতে ডাকতে চলে গেল কোনো রাতচরা পাখি। কাকচক্ষুর মতো স্বচ্ছ জ্যোৎস্নালোকে নদীর জল, গাছের পাতা, পার সংলগ্ন মন্দির, সাধুদের কুঠিয়া এখন স্পষ্ট দৃশ্যমান, কিন্তু নির্জন তটে একটি দুটি মানুষ, কিছু সারমেয় আর কয়েকটি নিশাচর প্রাণী ছাড়া কাউকে দেখা যাচ্ছে না।

সুশান্ত নিজের মধ্যে নিজে ডুবে গেছে। নদীর জলের স্রোতের দিকে চেয়ে ভাবতে চেষ্টা করছে একমাস আগে এইরকম সন্ধ্যায় সে কোথায় বসে কি করছিল সেই কথা। অকৃতদার সুশান্ত পরিবারের বড়ো, তার পরে দুটো ছোট বোন, লেখাপড়ায় সে বরাবর ভালো, কিন্তু তাও কলেজের শেষ পরীক্ষাটা সে দিল না ঘর ছাড়ার নেশায়। গেল বেনারস, সেখানে মন টিকলো না, গেল হরিদ্বার, সেখানে এক উচ্চকোটির মহাত্মা তাকে আশ্রয় দিলেন। দীক্ষা হল, হঠযোগ, রাজযোগ, লয়যোগ আয়ত্ত হল তার, এমন সময় সেই গুরুদেব দেহ ছাড়লেন। সুশান্তর মন আর ওখানে টিকলো না, তন্ত্র সাধনা করবে বলে তারাপীঠে কিছুদিন রইল, সেখান থেকে বক্রেশ্বরে এসে তান্ত্রিক গুরু লাভ হল, সাতবছর তান্ত্রিক অভিচারিক ক্রিয়া করে সাধনায় বেশ উন্নতি করছিল, এমন সময় সংসারের দায়িত্বের জন্য বাড়িতে ফিরতে হল।

বাড়িতে ফিরে চাকরি নিল সে, একে একে বোনেদের বিয়ে হয়ে সংসারে থিতু হল তারা, বাবা মারা গেলেন, নিজের সব টাকাপয়সা দিয়ে মায়ের ব্যবস্থা করে বোনেদের হাতে মায়ের দেখাশোনার ভার দিয়ে সে ঠিক করল নর্মদা পরিক্রমা করবে। বহু কাঠখড় পুড়িয়ে অমর কণ্টকে পৌঁছে শুনল আগামী দেড়মাস চাতুর্মাস্য থাকায় পরিক্রমা বন্ধ আপাতত। হঠাৎই কাকতালীয় ভাবে সেখানকার এক মাতাজী তাকে তাঁর আশ্রমে এই দেড়মাসের জন্য আশ্রয় দিলেন কিছু শ্রমের বিনিময়ে, সে রাজি হল। গতমাসে সেই মাতাজীর আশ্রমেই সে ছিল, কপিলধারা, মা কি বাগিয়া, দুধধারার আশে পাশে সাধু সঙ্গে তার সময় কেটেছে। তারপরে পরিক্রমা শুরু হতেই সে পরিক্রমাকারীর দলে নাম লিখিয়ে আজ দিন দশেক ধরে হেঁটে এই মাধবপুরে পৌঁছেছে। দৈহিক ক্লেশ তার মনকে প্রভাবিত করতে পারছে না আর তাই পায়ের ফোস্কা, কেটে যাওয়া সত্ত্বেও মনের ঐশ্বর্যের জোরে সে এই তাপ সহনের তপস্যায় এগিয়ে চলেছে। এই চলা নিজের আত্মচেতনের ব্রত পালন, এই পরিক্রমণ নিজের মোক্ষের পথের দ্বারের দিকে এগোনো। মা নর্মদার দর্শনেই যে মুক্তি সে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছে এই কদিনে।

মন তার এই কদিনেই যেন কোন এক অতীন্দ্রিয় জগতে ঘুরছে। শরীরটা তার নর্মদার নির্মল ধারায় স্নান করছে, একনিষ্ঠ হয়ে পূজাপাঠ করছে কিন্তু মনটি ভরে আছে অপার অনাবিল প্রশান্তিতে। সে অনুভব করছে, “আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর তোমার প্রেম হত যে মিছে।” তারও যে জগতের আনন্দযজ্ঞে নিমন্ত্রণ রয়েছে এই উপলব্ধিটি তাকে পথ চলার অনুপ্রেরণা যোগাচ্ছে। মা নর্মদার দিব্য উপস্থিতিতে সে পথ হারিয়েও আবার সঠিক পথে এসে উঠেছে বহুবার। মনের গহীনে ডুবে গিয়ে এই আত্মিক অনুভবটি বেশ নিবিড় হয়ে ছেয়ে গেছে যখন অন্তঃস্থলে, ঠিক সেই সময়ে কাঁধে একটা হাতের স্পর্শে তার চমক ভাঙলো। শঙ্করভারতীজী তাকে ডাকতে এসেছেন রাত্রির শয়নকাল সমাগত দেখে। জ্যোৎস্নার আলোকরাশি মাঝে সোমদেবকে মধ্য গগনে বিরাজ করতে দেখে সুশান্ত বুঝল বেশ রাত হয়ে গেছে। সে শঙ্কর ভারতীজীর সঙ্গে আশ্রম সংলগ্ন তার জন্য নির্দিষ্ট শয্যায় গিয়ে নিদ্রাদেবীর কোলে নিজেকে সমর্পণ করল। মনে বাজতে রইল কবীরজীর ভজনের কটি চরণ,

“রাম জপ জিয়া আইসে আইসে,
ধ্রুব প্রহ্লাদ জপিয়ে হরি যায়সে,
দিন দয়াল ভরোসে তেরে,
সব পারিয়ার চড়াইয়া বেরে।”

অলমিতি

BANGLADARSHAN.COM

॥অন্নদান॥

প্রেক্ষাপট

******

বৌদ্ধ সাহিত্যে বর্ণিত ষোড়শ জনপদের একটি ছিল মগধ, যার রাজা অজাতশত্রু ছিলেন হর্য্যঙ্ক রাজবংশের রাজা বিম্বিসার ও কোশল রাজকন্যা চেলেনার পুত্র। ৯২ খ্রীস্টপূর্বাব্দে গৌতম বুদ্ধের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ বৌদ্ধ ভিক্ষু দেবদত্তের প্ররোচনায় অজাতশত্রু বুদ্ধ ও বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষক বিম্বিসারকে হত্যার চেষ্টা করেন। বুদ্ধের মতাদর্শে বিশ্বাসী বিম্বিসার এই ঘটনায় তাঁর পুত্রকে ক্ষমা করে দেন। কিন্তু পুনরায় দেবদত্তের প্ররোচনায় অজাতশত্রু বিম্বিসার ও তাঁর উপদেষ্টামণ্ডলীকে গৃহবন্দী করে নিজেকে মগধের শাসক হিসেবে ঘোষণা করেন। ৪৯১ খ্রীস্টপূর্বাব্দে গৃহবন্দী অবস্থায় বিম্বিসারের মৃত্যু ঘটে। এই সময় দেবদত্তের প্ররোচনায় তিনি গৌতম বুদ্ধকে হত্যার চেষ্টা করেন। পিতার মৃত্যুর পর অনুশোচনায় দগ্ধ অজাতশত্রু শান্তিলাভের আশায় বিভিন্ন ধর্ম উপদেষ্টা ও দার্শনিকের শরণাপন্ন হন। কিন্তু তাঁদের উপদেশে শান্তিলাভে ব্যর্থ হয়ে রাজবৈদ্য জীবকের উপদেশে গৌতম বুদ্ধের শরণাপন্ন হলে বুদ্ধ তাঁকে সাম্যফলসুত্ত ব্যাখ্যা করেন।

কোশলের সঙ্গে যুদ্ধ

****

BANGLADARSHAN.COM

বিম্বিসারের বন্দীত্ব ও মৃত্যুর ঘটনায় ক্রুদ্ধ কোশলরাজ প্রসেনজিৎ একদা উপহার হিসেবে প্রদত্ত কাশী রাজ্য পুনরায় নিজের অধীনে নিয়ে নিলে অজাতশত্রু কোশল রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। প্রথম যুদ্ধে তিনি বিজয়ী হলেও পরের যুদ্ধে পরাজিত হন। কিন্তু গৌতম বুদ্ধের মতাদর্শে বিশ্বাসী প্রসেনজিৎ তাঁকে মুক্ত করেন এবং তাঁর কন্যা বজিরাকে তাঁর সাথে বিবাহ দিয়ে যৌতুক হিসেবে কাশী রাজ্য ফিরিয়ে দেন।

গঙ্গার উত্তরে ছিল কোশল রাজ্য, এটিও বৌদ্ধ সাহিত্যের ষোড়শ জনপদের আর একটি। এই রাজ্যেরই এক সমৃদ্ধশালী নগরী ছিল শ্রাবস্তী। গৌতম বুদ্ধের সঙ্গে শ্রাবস্তী নগরীর সম্পর্ক ছিল নিবিড়। সুদত্ত ছিলেন শ্রাবস্তী নগরীর একজন ধনী শ্রেষ্ঠী যিনি ব্যবসায়ের কাজে মগধের রাজধানী রাজগৃহ নগরীতে গিয়েছিলেন। ওই রাজগৃহ নগরীতেই সুদত্ত প্রথম বুদ্ধকে দেখেছিলেন এবং বুদ্ধের সঙ্গে কথা বলে তাঁর এক পরম ভক্তে পরিণত হন। বুদ্ধকে একবার শ্রাবস্তী যাওয়ার অনুরোধ করেন সুদত্ত। বুদ্ধ রাজী হন। কিছুকাল পরের কথা। বুদ্ধ শ্রাবস্তী আসছেন; সঙ্গে কয়েক হাজার শিষ্য। এত লোককে কোথায় থাকবার আয়োজন করা যায় ভেবে সুদত্ত চিন্তিত হয়ে পড়লেন। শ্রাবস্তী নগরীর বাইরে যুবরাজ জেত এর বিশাল একটি বাগান ছিল। সুদত্ত বাগানটি কিনতে চাইলে জেত প্রথমে রাজী হননি। পরে শর্তসাপেক্ষে রাজী হন–স্বর্ণমুদ্রায় সম্পূর্ণ বাগান ঢেকে দিতে হবে। সুদত্ত সম্মত হলেন। সুদত্ত গোশকট করে স্বর্ণমুদ্রা এনে বাগান ঢেকে দেওয়ার নির্দেশ দেন। সুদত্তর পরম বুদ্ধভক্তি

দেখে জেত অভিভূত হয়ে পড়েন। তিনি সুদত্তকে বাগানখানি দান করেন। কৃতজ্ঞতাস্বরূপ সুদত্ত জেত এর নামে বাগানের নাম রাখেন জেতবন।

বুদ্ধ শ্রাবস্তী এলেন। ধ্যান করলেন, দান করলেন; শ্রাবস্তী নগরীকে অমর করে রাখলেন। রাজকুমার জেত অসম্ভব ধনাঢ্য ছিলেন; তিনি বুদ্ধকে আঠারো কোটি স্বর্ণ মুদ্রা দান করেন। সুদত্ত বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। সুদত্ত অনাথদেরকে অন্ন (পিণ্ডক) দিতেন বলে তাঁকে অনাথপিণ্ডিক বা অনাথপিণ্ডিদ বলা হত। অনাথপিণ্ডিক বা অনাথপিণ্ডদ নামটি বুদ্ধই দিয়েছিলেন। গৌতম বুদ্ধের ব্যবহারের জন্য সুদত্ত গন্ধকাষ্ঠ দিয়ে একটি কুঠির নির্মাণ করে দেন 'গন্ধকুঠির' নামে যেটিতে বুদ্ধদেব অবস্থান করতেন।

আখ্যান

*****

অজাতশত্রুর সঙ্গে যুদ্ধের ফলস্বরূপ কোশলের রাজধানী শ্রাবস্তীতে খাদ্যাভাব, দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। সেই দুর্ভিক্ষের কবল থেকে নগরীর জনগণকে রক্ষা করার অপরূপ ঘটনাটি এই আখ্যানের উপজীব্য। অনাথপিণ্ডদ সুদত্ত কন্যা সুপ্রিয়াও পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে বৌদ্ধ বিক্ষুণী সংঘে যোগ দেন এবং তথাগতের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। সেই দুর্ভিক্ষ কবলিত শ্রাবস্তীর এক সন্ধ্যায় বুদ্ধদেব তাঁর প্রত্যেক ভক্তগণের কাছে গিয়ে জনে জনে জানতে চাইলেন যে কে ক্ষুধিতের অন্নদান সেবার ভার নিতে ইচ্ছুক। শ্রাবস্তীর ধনবান শ্রেষ্ঠী তথাগতের পরমভক্ত রত্নাকর শেঠ প্রথমে মাথা হেঁট করে কিছুক্ষন দাঁড়িয়ে থেকে হাত জোড় করে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, "প্রভু, মার্জনা করুন, এই ক্ষুধার্ত বিশাল পুরীর ক্ষুধা মেটানোর ক্ষমতা আমার নেই।" শ্রাবস্তীর সামন্ত রাজা তথাগতভক্ত জয়সেন বললেন, "প্রভু আপনার আদেশ মাথা পেতে নিতাম যদি আমার বুক চিরে রক্ত দিলে সেটা কোনো কাজে আসত, আমি অপারগ, আমার ঘরে কোথায় অন্নের সংস্থান আছে আজ?" ধর্মপাল নামে আরেক সম্পন্ন কৃষক বুদ্ধভক্ত বললেন, "কি আর বলব প্রভু, আমার এমন পোড়া কপাল যে আমার অমন সোনার খেত যেন অজন্মায় পালিত প্রেতের মত ধুঁকছে, রাজকর দেওয়াই কঠিন হয়ে গেছে, আমি অক্ষম, দীনহীন হয়ে গেছি।" সেই সভাঘরে সকলে একে অপরের মুখের দিকে চেয়ে রয়েছে, কারো মুখে কোনো উত্তর নেই, ব্যথিত শ্রাবস্তী নগরীর নির্বাক সেই সভাগৃহে তথাগতের করুণ দুটি নয়ন সন্ধ্যার ম্রিয়মান তারার মত চেয়ে রইল সবার দিকে। তখন ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো লজ্জারক্তিম আননে অনাথপিণ্ডদের কন্যা সুপ্রিয়া, যিনি বুদ্ধদেবের ব্যথায় ব্যথিত হয়ে বুদ্ধদেবের পদস্পর্শ করে চরণধূলি মস্তকে নিয়ে বললেন, "আমি ভিক্ষুণীরও অধম সুপ্রিয়া, আমি প্রভুর আজ্ঞা মাথা পেতে নিলাম, খাদ্যহারা যারা কাঁদছে, তারা আমার সন্তান, নগরীতে অন্ন বিতরণ করার ভার আমি নিলাম।" সকলে বিস্মিত হয়ে বলল, "তুমি ভিক্ষুকন্যা, নিজেও তুমি ভিক্ষুণী, কোন অহংকারে মেতে মাতা পেতে এমন গুরু দায়িত্বের কাজ নিচ্ছ?" সুপ্রিয়া বলল, "আমি দীনহীন মেয়ে, সবার চেয়ে অক্ষম, তাই নিশ্চয় তোমাদের দয়া পাব, প্রভুর আজ্ঞা বিজয়ী হবে, ক্ষুধার্ত অন্ন পাবে। আমার ভান্ডার ভরে আছে তোমাদের সকলের ঘরে ঘরে, আমার শুধু এই ভিক্ষা পাত্র আছে, তোমরা চাইলে সেই ভিক্ষা পাত্র অক্ষয় হবে, ভিক্ষার অন্নে ধরণীকে বাঁচাব, দুর্ভিক্ষের ক্ষুধা মেটাবো।" তথাগতের আশীর্বাদ

BANGLADARSHAN.COM

নিয়ে অনাথপিণ্ডদ সুতা সুপ্রিয়া তাঁর মহৎ কার্যে প্রবৃত্ত হল এবং অন্নদানে ক্ষুধিতকে জীবনদান করল। সুযোগ্য পিতার সুযোগ্য পুত্রীর কর্মের মধ্যে দিয়ে মহৎ হৃদয়ের ধারাটি অব্যাহত রইল।

@কৈশোরের পাঠ্য শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘নগরলক্ষ্মী’ কবিতা অবলম্বনে।

BANGLADARSHAN.COM

॥ইষ্টশক্তি॥

গঙ্গোত্রী দর্শন করে নিচের দিকে নামছে সুরজ। পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে পা দিয়ে পাকদন্ডী রাস্তায় নামতে নামতে দুবার সে পথ হারিয়েছে, দুবারই তাকে কোনো না কোনো গ্রামবাসী ঠিক রাস্তায় এনে দিয়ে গেছে। শিবক্ষেত্র দেবভূমির এই পথে ঘণ্টা তিনেক হেঁটে এসে পৌঁছল হিমালয়ের কোলে উত্তরাঞ্চলে রনকপুর নামে এক প্রত্যন্ত গ্রামে। গ্রামে কয়েকঘর লোকের বাস, এতোটা ওপরে আর ভীষণ ঠান্ডা বলেই হয়তো লোকবসতি কম এখানে। গ্রামের মাঝখানে আছে একটা শিবমন্দির আর একটা রাধাকৃষ্ণের মন্দির। গ্রামের একধার দিয়ে বয়ে চলেছে গঙ্গার ক্ষীণ ধারা, চঞ্চল বালিকার মতো পাথরের খাঁজ দিয়ে সে ছুটে চলেছে সমতলের দিকে। গঙ্গামায়ের এই রূপ দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন যে এই জলধারা আমাদের সভ্যতাকে যুগ যুগ ধরে বাঁচিয়ে রেখেছে। গঙ্গার ওই জলের ধারা ধরে এসেই সুরজ পৌঁছল এই রনকপুর গ্রামে প্রায় সায়াহ্নে।

দ্রুত দিন শেষ হয়ে আসছে, ঠান্ডাও বাড়ছে। সুরজকে সন্ধে নামার আগে নিজের রাতের আশ্রয়টুকু জোগাড় করে নিতে হবে। সুরজ পায়ে পায়ে গিয়ে দাঁড়ালো শিবমন্দিরের দালানে। মন্দির এখন খুলেছে কিন্তু পূজারীজী নেই সেখানে। একটু পরে সন্ধ্যারতির ঠিক সময় পূজারীজী এলেন, সুরজকে দেখে বুঝলেন যে সে পরিব্রাজক। তার অযত্নে লালিত অজস্র দাঁড়িগোফের জঙ্গলে ঢাকা কচি মুখখানি দেখে বোধহয় মায়া হল পূজারীজী ভীমশঙ্করজীর। তিনি মন্দির সংলগ্ন ঘরে সুরজের থাকবার বন্দোবস্ত করে দিয়ে সাতটায় চলে গেলেন নিজের বাড়িতে। রাত্রে এই অঞ্চলে খুব ঠান্ডা পড়ে আর ভালুক বেরোয়। তাই সুরজকে ভালো করে দোর দিয়ে শুতে বলে তিনি চলে গেলেন।

BANGLADARSHAN.COM

নিস্তব্ধ রাত্রে নদী সংলগ্ন গ্রামেতে হরেক আওয়াজ প্রথমে কর্ণগোচর হচ্ছিল। ধীরে ধীরে সেই আওয়াজগুলো কমে এলো। সেদিন পূর্ণিমা। চরাচর যেন গলিত রূপো দিয়ে মুড়ে দিয়েছেন প্রকৃতিদেবী, দূরে রজতশুভ্র গিরিশৃঙ্গ যেন শীতল জ্যোৎস্নায় আস্নানে রত। রাধাকৃষ্ণ মন্দিরের সন্ধ্যারতির ঘণ্টাধ্বনিও থেমে গেছে। দূর থেকে রাতচরা পাখিদের ডাক শোনা যাচ্ছে আর শোনা যাচ্ছে অবিরাম জলধারার কুলুকুলু রব। শুয়ে শুয়ে সুরজ ভাবছে নিজের ফেলে আসা দিনের কথা।

গাড়োয়ালের এক সম্পন্ন চাষী পরিবারের ছেলে সে, কিন্তু বড়োই অভাগা। জন্মানোর আগেই হিল ডাইরিয়াতে বাবা চলে গেছিলেন আর সুরজের যখন পাঁচ বছর বয়স হঠাৎ তিন দিনের জ্বরে মা চোখ বুঝলেন। এতবড় পৃথিবীতে একদম একা হয়ে গেল সে, আশে পাশে জ্ঞাতিরা কয়েকদিন “আহা উহু” করল কিছুদিন, কিন্তু কেউ দায়িত্ব নিল না। গ্রামের ধারে এক সন্ন্যাসীর ডেরা ছিল যেখানে মা শিশু সুরজকে নিয়ে প্রায়ই যেতেন, সন্ন্যাসী নানান সৎ কথা আলোচনা করতেন, মা কিছু বুঝতেন কিনা জানে না সুরজ, কিন্তু গিয়ে বসে থাকতেন। মাঝে মাঝে সন্ন্যাসী রামায়ণ পাঠ করতেন, মা সুরজকে নিয়ে বসে সেগুলো শুনতেন। সুরজেরও ভারী ভালো লাগত ওই রামায়ণের কাহিনী শুনতে।

মা চলে যেতে কয়েকদিন অনাহারে থেকে একদিন ছোট্ট সুরজ পায়ে পায়ে গিয়ে উপস্থিত হল সেই সন্ন্যাসীর কাছে। সন্ন্যাসী শিশু দেখে নারায়ণ জ্ঞানে এক সপ্তাহ ওকে রোজ খাওয়ালেন। তারপরে একদিন ওর সঙ্গে এসে ওর জ্ঞাতি কাকাদের সাথে কথা বলে বাড়িঘরের ভার তাদের হাতে দিয়ে শিশু সুরজকে নিয়ে গ্রাম ছাড়লেন। সন্তানস্নেহে ওকে সঙ্গে করে নিয়ে উপস্থিত হলেন উত্তর প্রদেশের রাজাপুরে, তুলসীদাসজীর জন্মস্থানে। সেখানে কিছুদিন থেকে ওকে দীক্ষা দিলেন এবং কিছু কিছু লেখাপড়া শেখাতে লাগলেন। প্রায় সাত বছর সেখানে থেকে সেখান থেকে এলেন চিত্রকুটে। এই সন্ন্যাসী নিজে ছিলেন রামায়েৎ সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী, তাই রামই ছিল তাঁর উপাস্য, ওকেও উনি রাম মন্ত্রেই দীক্ষা দিয়েছিলেন আর শিখিয়ে ছিলেন যেকোনো অবস্থায় রামের শরণ নিতে। তারপরে ওর আঠারো বছর বয়স হলে ওকে পাঠিয়েছেন সারা ভারত পরিব্রাজন করে ইষ্টের মাহাত্ম্য বুঝতে। একরকম একবস্ত্রে আজ পাঁচ বছর সে পরিব্রাজনা করছে। বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও পড়েছে, কিন্তু বেরিয়েও এসেছে, রামনামের মাহাত্ম্য তো সে বুঝেইছে, সঙ্গে সঙ্গে এটাও উপলব্ধি হয়েছে সুরজের যে তার গুরু ওই সন্ন্যাসী রামশরণজী নিজেও একজন সিদ্ধ মহাত্মা যিনি শক্তি রূপে সর্বদা রয়েছেন শিষ্যের সঙ্গে। এইসব সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে সুরজের কখন চোখটা ঘুমে জড়িয়ে এসেছে ও নিজেও জানে না।

হঠাৎ প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে প্রায় শেষ রাতের দিকে ওর ঘুম ভেঙে গেল। যদিও পূজারী ভীমশঙ্করজী ওকে রাত্রে বেরোতে বারণ করেছিল এক্ষেত্রে ওকে তো যেতেই হবে, ও উঠে মন্দির সংলগ্ন ঘরের দরজা আলতো করে খুলে বাইরে এলো, দরজাটা ভেজিয়ে ও এগোলো সামনের নদীর ধারের দিকে, সেখানে প্রাকৃতিক কর্মটি সেরে ফেরার সময় হঠাৎ দেখল ওর সামনে একটা সচল কালো পাহাড় দৌড়ে ওর দিকে এগিয়ে আসছে। ভয়ে ওর প্রাণ উড়ে যাবার জোগাড় তখন, অথচ পালানোর কোনো উপায় নেই। ওর বোধ বুদ্ধি কিচ্ছু কাজ করছে না তখন, কিভাবে যেন মনে পড়ল গুরুবাক্য ইষ্টমন্ত্র জপ করার কথা, সুরজ সেটাই করতে লাগল আর চোখের সামনে দেখতে লাগল একটু একটু করে মৃত্যুর ওর দিকে এগোনো। ওর পা দুটো যেন কেউ গেঁথে দিয়েছে মাটির সঙ্গে।

ঠিক হাত পাঁচেক যখন দূরত্ব ওর সঙ্গে ভালুকটার, হঠাৎ কোথা থেকে একটা বিশালদেহী হনুমানের উদয় হল আর সুরজ কিছু বোঝার আগে ওর হাল্কা শরীরটাকে দুহাতে তুলে নিয়ে দৌড়ে এসে ওকে মন্দিরের ঘরের দোরগোড়ায় নামিয়ে দিয়ে নিমেষে কোথায় মিলিয়ে গেল।

এদিকে ঘটনার আকস্মিকতায় সুরজ বিহ্বল হয়ে স্থানুর মত দাঁড়িয়ে ছিল মন্দিরের সেই ঘরটার সামনে, সেই ভালুকটাকে মন্দিরের দিকে আসতে দেখে ওর হুঁশ হল, ও তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে নিমেষে ঘরের দরজা আটকে দিল। শিকার ফস্কে যাবার রাগে সেই ভালুক এসে বেশ কয়েকবার দরজাটা আঁচড়ালো, শেষ ভীষণ রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে বিফল মনোরথ হয়ে চলে গেল একসময়।

BANGLADARSHAN.COM

সুরজ একটু ধাতস্ত হয়ে ভাবতে বসল ইষ্ট আর গুরুর অপার কৃপার কথা, এই সব ভাবতে ভাবতে আর একদম মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে আসার কথা ভেবে বাকী রাতটা আর ঘুম এলো না সুরজের চোখে।

বেলা সাতটায় পূজারীজী আসলে সে বাইরে এসে নদীতে স্নান সেরে গঙ্গাজল দিয়ে মহাদেবের পুজো করতে বসে কেঁদে ফেলল। পূজারীজী তাই দেখে ওকে জিজ্ঞেস করলেন কী ব্যাপার, সুরজ আগের ঘটনা আনুপূর্বিক ওঁকে বলতে উনি বললেন যে এখানে বাঁদরের উৎপাত আছে বটে কিন্তু এতো বড়ো হনুমান যে মানুষকে বয়ে নিয়ে যেতে পারে তেমন তো আছে বলে জানেন না।

প্রথম পর্বের শেষ ভাগ

****

তারপরে মন্দিরে আগত গ্রামবাসীদেরও জিজ্ঞেস করলেন যে তারা কেউ এতো বড়ো হনুমান দেখেছে কিনা, তারাও একই কথা বলল যে এতো বড়ো হনুমান এই গ্রামে নেই। তখন ভীমশঙ্করজী বললেন সুরজকে, “তুম তো সাচ্চে দিল সে পরিব্রাজন কর রহে হো, ইসিলিয়ে স্বয়ং রুদ্রাবতার হনুমানজী আয়ে থে তুমহে রক্ষা করনে।” কৃতজ্ঞতা আর অনুপম উপলব্ধিতে সুরজ কাঁদতে কাঁদতে এগিয়ে চলল সামনের রাস্তা ধরে ওর পরবর্তী গন্তব্যে।

দ্বিতীয় পর্ব

******

BANGLADARSHAN.COM

হাঁটতে হাঁটতে অনেকটা রাস্তা চলে এসেছে বুঝতে পারছে সুরজ। গঙ্গার তীর ধরে নামছে সে, কিছু কিছু জায়গায় তাকে খাড়া পাহাড় পেরোতে হলেও সে এইভাবে নামতেই স্বচ্ছন্দ বোধ করছে, কারণ এতে সহজে পথভ্রষ্ট হবার ভয় কম। রাস্তায় আসতে আসতে সে পেরিয়েছে বিভিন্ন ডালের ক্ষেত, কোথাও অড়হর ডালের ক্ষেত, কোথাও মুসুর ডালের ক্ষেত, কোথাও ছোলা বা চানার ক্ষেত, কোথাও আবার বিস্তীর্ণ আনাজের ক্ষেত, হয়ে রয়েছে ক্ষেতের মধ্যে ফুলকপি, বাঁধাকপি, টমেটো, বেগুন, কড়াইশুঁটি মত নানাবিধ সব্জি। উত্তরাঞ্চলের এইদিকটার জনপদগুলির বাসিন্দারা মূলতঃ নিরামিষাশী গোবলয়ের অন্তর্ভুক্ত, তাই তাদের সব্জি আর ডালটাই মুখ্য খাবারের মধ্যে পড়ে। আর প্রায় প্রতি বাড়িতে এরা গোপালন করে, কোথাও কোথাও ছাগলও রাখে দুধের জোগানের জন্য। নিতান্তই গরীব এখানকার অধিবাসীরা কিন্তু অদ্ভুত অতিথিবৎসল, এদের কাছে অতিথি মানেই নারায়ণ আর সেই নারায়ণের সেবা এদের ধর্ম। নিজেরা না খেয়েও আতিথেয়তায় কোনো ত্রুটি রাখে না এরা।

আজকে চলেছে সুরজ রাস্তা ঘন অরণ্যের মধ্য দিয়ে। বিরাট বিরাট বহু প্রাচীন মহিরুহের সাথে লতানে লতাগাছের সমাহার এই অরণ্যতে। প্রচুর চেনা অচেনা পাখির কাককাকলিতে মুখরিত অরণ্যভূমি, গাছে গাছে ঝুলছে পাখির বাসা, বেশ কিছু বাবুই পাখির বাসা চোখে পড়ল ওর। প্রায় প্রতিগাছের ওপরে অজস্র পাখিদের বাসা আর তাতে রয়েছে তাদের ছানাগুলো, তাই আশেপাশেই হয় মা পাখি নয় বাবা পাখিগুলো রয়েছে। বনবেড়াল, খরগোশ, কাঠবেড়ালি ঘুরে বেড়াচ্ছে বনের ভেতরে। লোকমুখে শুনে এসেছে ভালুক আর চিতার

আনাগোনা আছে এদিকটাতে। তাই সাবধানে চলতে হচ্ছে। বেশ কিছু গাছে ঝুলছে মৌমাছির চাক, অভিজ্ঞতা থেকে জানে ও যে ঐ গাছগুলোর কাছে যাওয়া বিপজ্জনক, কারণ মৌমাছির ঝাঁক এসে হুল ফুটিয়ে দিলে সেটা খুবই পীড়াদায়ক।

হাতের লাঠি আর ঝোলা নিয়ে দেখেশুনে এগোতে হচ্ছে, প্রচুর কাঁটাগাছের বন হয়ে আছে, একটা জায়গায় একটু তাড়াতাড়ি হবে মনে করে ও কাঁটাগাছের সেই বনের মধ্যে ঢুকল, এবারের যত এগোচ্ছে চারিদিক থেকে কাঁটাঝোপ যেন ঘিরে ধরতে লাগল ওকে। যে রাস্তা দিয়ে ঢুকেছিল সেই রাস্তাটাও আর খুঁজে পাচ্ছে না, জামাকাপড়, ঝুলি সব কাঁটার আঘাতে কণ্টকিত হয়ে ছিঁড়ে খুঁড়ে একাকার। সুরজ সমানে "জয় শ্রীরাম" বলে ধ্বনি দিতে লাগল যদি কোনো গ্রামবাসী বা পথচারীর কানে ওর ডাক পৌঁছয়, কিন্তু কোনো জবাব পেল না, কেঁদে ফেলল সুরজ। কাঁদতে কাঁদতে হঠাৎ চোখে পড়ল ওপরে পাহাড়ের খাঁজ ঘেঁষে একটা পাকদন্ডী রাস্তা যেটাও কাঁটাগাছে ভরা কিন্তু হাঁটা যাবে। প্রায় বুকে হেঁটে সুরজ উঠে এলো সেই পাকদন্ডী রাস্তাটাতে। কিছুদূর অগ্রসর হবার পরে দেখতে পেল রাস্তা অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার হচ্ছে সামনে, ও এগোতে লাগল। আরো বেশ কিছুটা পথ আসার পরে চাষের ক্ষেত দেখতে পেল, এক কৃষককে জিজ্ঞেস করে জানলো সামনেই পীচের রাস্তা আছে। আস্তে আস্তে ঐ পীচের রাস্তায় যখন উঠল ও তখন আর বেশী বেলা বাকী নেই। দ্রুত পা চালিয়ে সুনারি গ্রামে পৌঁছল সুরজ। তখন আর ওর দাঁড়ানোর ক্ষমতা নেই।

BANGLADARSHAN.COM

এসে কোনোরকমে দেহটাকে সমর্পণ করল সামনের শিবমন্দিরের দালানে এবং ক্ষুধিত আর ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। গোটা শিবমন্দির চত্বর জুড়ে বেশ কিছু বাঁদর বসে আছে। ও আর সেসব নিয়ে মাথা ঘামানোর অবস্থায় ছিল না তখন। সুনারি গ্রামের ধারে একদম শেষ প্রান্তে এই মন্দির, খুবই কম জনবসতি এখানে। কতক্ষন ঘুমিয়েছে ও জানে না, একসময় দেখল কেউ একটা ওকে নাড়াচ্ছে প্রবল ভাবে। ও উঠে বসে অবাক হয়ে দেখল একটা মুখপোড়া হনুমান ওকে ডাকছে, ও উঠে বসতে ওর সামনে রাখা কিছু পাকাফল ওকে দেখিয়ে সে চলে গেল। সুরজ লক্ষ্য করে দেখল ওর কয়েক হাতের মধ্যে বেশ কয়েকটা বাঁদর আর হনুমান বসে আছে, ঘুরে বেড়াচ্ছে কিন্তু ওর সামনের ঐ ফলগুলোতে কেউ হাত দিচ্ছে না। সবে অন্ধকার নামছে চরাচরে, একটা দুটো প্রদীপ জ্বলে উঠেছে দূরের কুটিরের ভেতরে, সন্ধ্যার শঙ্খ ধ্বনি আর ধূপের গন্ধ ভাসছে বাতাসে। সুরজ ফল কটা হাতে নিয়ে ঝোলা আর লাঠিটা মন্দিরের দালানে রেখে অনতিদূরে প্রবাহিত গঙ্গার পুণ্য শীতল ধারায় আগে নিজে অবগাহন করে তারপরে ফল কটা ধুয়ে নিয়ে মন্দিরের দালানে ফেরত এসে দেখল মন্দিরের পূজারীজী এসে গেছেন সন্ধ্যারতি করতে। পূজারীজী সন্ধ্যারতি সমাপান্তে ওকে পুজোর দুধ, খোয়া, আটার হালুয়া প্রসাদ দিয়ে মন্দিরের ভেতরে ওর শোবার ব্যবস্থা করে চলে গেলেন। সুরজ সেই ফলের সঙ্গে এই প্রসাদ নিয়ে খেতে বসছে যখন সেই হনুমানটা এসে ওর সামনে বসল, সুরজ সব খাবারটা দু ভাগে ভাগ করে একটা ভাগ ঐ হনুমানটাকে দিলে পরে সে তার ভাগ থেকে ফলগুলো সুরজের ভাগে তুলে দিয়ে শুধু প্রসাদটা গ্রহণ করল। সুরজ খুব অবাক হল। খেয়ে নিয়ে গিয়ে শুয়ে পড়ল সুরজ।

পরেরদিন বেরিয়ে এগোনোর সময় বেশ কিছুদূর ওর সঙ্গে সঙ্গে এলো সেই হনুমানটা, তারপরে ফিরে গেল, যেন এগিয়ে দিতে এসেছিল। আবার জঙ্গলের রাস্তায় চলতে চলতে সুরজ এসে উপস্থিত হল রুদ্রপ্রয়াগের আগের একটা গ্রামে। বেলা তখন আড়াইটে। অড়হর ক্ষেতের পাশ দিয়ে রাস্তা, একটু এগোতেই ক্ষেতে কর্মরত কৃষকটি এসে হাত জোড় করে ওকে অনুরোধ করল ঐ কৃষকটির গ্রামে রাম মন্দিরে সেই রাতে অতিথি হতে। সুরজকে রীতিমতো অনুনয় বিনয় করে নিয়ে গেল গ্রামের ভেতরে। সেই মন্দিরের একটু দূরেই ঐ কৃষক সুখনরামের বাড়ি। সুরজকে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে চা, পুরী, কড়াইশুঁটির সব্জি আর খোয়া খাওয়ালো, এরা বলে সেবা দেওয়া। খেতে খেতে সুরজ সুখনরামের পরিবারের লোকের মুখে জানতে পারল যে সুখেনরামের গত তিনদিন ধরে প্রবল জ্বর যাতে সে বেশ কাহিল হয়ে পড়েছে, আশে পাশে ডাক্তার না থাকায় তারা তেমন ওষুধের ব্যবস্থা করতে পারেননি। সুরজের কাছে তার ঝোলার মধ্যে কিছু জড়িবুটির ওষুধ মজুত থাকে সবসময় আপদে বিপদে লাগবে বলে। সুরজ তখনি কিছুটা ওষুধ সুখনরামকে সামনে বসে খাওয়ালো, বাকিটা সুখনরামের মেয়ের হাতে দিয়ে সেই রাম মন্দিরে এসে আশ্রয় নিল। নিজের ইষ্ট মূর্তির সামনে বসে সারারাত প্রায় তার স্মরণ, মনন করল। একসময় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। রাত্রে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখল ধনুর্ধারী শ্রীরামচন্দ্র যেন তাকে বলছেন যে ওকে এই গ্রামে উনি নিয়েই এসেছেন সুখনরামের অসুখ সারাতে আর তিনি ওর ঝোলাতে আরো তিনগুণ জড়িবুটি রেখে দিয়েছেন যেগুলো পরেরদিন যেন সুরজ সুখনরামকে দিয়ে দেয়, সুখনরাম আর দুদিনেই ভালো হয়ে যাবে। পরেরদিন সকালে উঠে সুরজ দেখল সত্যিই তার ঝোলাতে প্রচুর জড়িবুটি ভরে গেছে। বিদায় নেবার আগে সুখনরামের বাড়ি গিয়ে সেগুলো সুখনরামকে দিতে গিয়ে শুনল আগের রাত্রি থেকেই আর সুখনরামের জ্বর আসেনি।

BANGLADARSHAN.COM

ওষধিগুলো সুখনরামের হাতে দিয়ে এগোতে এগোতে ভাবতে লাগল সুরজ যে সুখনরামের অসুখকে কেন্দ্র করে শ্রীরামচন্দ্র কী অদ্ভুত লীলাই করলেন আর বার বার মাথায় ঠেকালো তার ঝোলাকে কারণ এই ঝোলা প্রভু রামের স্পর্শে ধন্য হয়ে গেছে!!! সুরজের মনে পড়ল তার গুরু রামশরণজীর মতে ইষ্ট দর্শন সর্ববস্থায় সত্য, সে স্বপ্নে হোক আর জাগরণেই হোক। তার ইষ্ট শ্রীরামচন্দ্র তাকে স্বপ্নে দর্শন দিয়েছেন, এতো বড়ো সৌভাগ্যের ব্যাপারটা যখনই সে ভাবছে তখনি তার চোখের জল বাঁধা মানছে না, এখুনি তার মনে হচ্ছে ছুটে একবার চিত্রকুটে গিয়ে গুরুর চরণবন্দনা করে আসতে। রামশরণজী শুধু তার গুরু নন, তিনি পিতা, মাতা, বন্ধু, সখা সব, তাই তাঁর দর্শনের জন্য মন সুরজের অকুল হয়ে আছে। সে ঠিক করল এই চারধাম পরিব্রাজনা শেষ করে সে একবার চিত্রকুটে গিয়ে কিছুদিন থেকে গুরুর দর্শন আর সেবা করে আবার বেরোবে পরিব্রাজনায়।

॥মাতৃকৃপার অমৃতধারায়॥

শ্রী গুরু চরণ সরোজ রজঃ নিজমন মুকুর সুধার
বরনউ রঘুবর বিমল যশ জো দায়ক ফল চার।
বুদ্ধিহীন তনু জানিকে সুমিরো পবন কুমার
বল বুদ্ধি বিদ্যা দেহু মোহে হরহু কলেস বিকার।

–গোস্বামী তুলসীদাস

অর্থ–গোস্বামী তুলসীদাসজী বলছেন শ্রীগুরুর চরণকমলের ধূলি দিয়ে নিজের মনের আয়নাকে মুছে রঘুবরের অর্থাৎ শ্রীরামচন্দ্রের মালিন্যবর্জিত যশ কীর্তন করছি যা চতুর্বর্গ ফল অর্থাৎ ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ, দান করে, আমি বুদ্ধিহীন জেনে আমার গুরু পবনকুমার হনুমানজীর গুণগান করে প্রার্থনা করছি আমায় যেন তিনি বল, বিদ্যা, বুদ্ধি দিয়ে ক্লেশ ও বিকার হরণ করেন।

আমি এখানে আমার অতি ক্ষুদ্র সামর্থে যথাশক্তি আমার শ্রীরাম-কৃষ্ণ-দূর্গা-কালী-জীবন্মুক্ত মহাত্মা-পরমা প্রকৃতি স্বরূপা শ্রীগুরুর কীর্তন করতে প্রবৃত্ত হয়েছি তাঁরই চরণপদ্ম বন্দনা করে। “গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা।”

BANGLADARSHAN.COM

তুমি অরূপ স্বরূপ সগুণ নির্গুণ
দয়াল ভয়াল হরি হে,
আমি কিবা বুঝি, আমি কিবা জানি,
আমি কেন ভেবে মরি হে।

কিরূপে এসেছি কেমনে বা যাব,
তা ভাবিয়ে কেন জীবন কাটাব,
তুমি আনিয়াছো তোমারেই পাব,
এই শুধু মনে করি হে।

–কবি রজনীকান্ত সেন

আজ থেকে প্রায় চব্বিশ বছর আগের কথা, ঘর গুছোতে গিয়ে একটা বই হাতে এল যার সামনের পাতা, পিছনের পাতা নেই, মাঝখানের কিছু পাতা অক্ষত আছে। বইটি ছিল শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের “পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ।” বইটি বেশ কয়েকবার পড়ে প্রথম থেকে পড়ার আগ্রহ বেড়ে গেল। যিনি আমাদের কাগজ দেন, তিনি বইপত্র দরকার মতো এনে দিতেন, তাঁকে বললাম ঐ বইটি যদি এনে দেন, তিনি বললেন যে বইটির তিনটি খণ্ড, আমার কোন খণ্ডটি প্রয়োজন? বললাম, “প্রথম খণ্ডটি আগে এনে দিন।” তিনি এনে দেবেন বললেন, কয়েকদিন পরে ফোন করে বললেন যে বইটির অখণ্ড সংকলন বেরিয়েছে, একটু বেশী দাম, আমি

নেব কিনা। আমি এনে দিতে বললাম। বইটা এল, আমি বার চারেক পড়ে আমার কর্তাকে জোড় করে পড়ালাম, কারণ সে অফিস আর বাজনার বাইরে সময় দিতে নারাজ, তবু পড়ল এবং আমার মতই উচ্ছ্বসিত হল। জনৈক কবি শ্রীঅচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত সম্পর্কে ঠিকই বলেছিলেন, "ঠাকুর তোমাকে কে চিনতো, যদি না চেনাতো অচিন্ত্য?" এরপরে পড়লাম ঐ লেখকেরই "পরমা প্রকৃতি শ্রীশ্রী মাসারদা", শ্রীম কথিত "রামকৃষ্ণ কথামৃত" পড়লাম, শ্রীসারদানন্দজীর লেখা "শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গে" পড়লাম। জানলাম এবং উপলব্ধি করলাম যে মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর দর্শন আর সারা জীবন মানুষকে সেই দর্শনের জন্য প্রয়াস বা সাধনা চালিয়ে যেতে হয়।

আমাদের দুজনেরই মনে হয়েছিল যে ঠাকুর, শ্রীমা এঁদের আমরা সঙ্গ করতে পারলাম না, এটাই জীবনের সবচেয়ে বড়ো আফশোস। যত এঁদের সম্পর্কে জেনেছি, ততই আমাদের আফসোস বেড়েছে। তখনও জানিনা তাঁদের কৃপা কি ভাবে আমাদের কাছে আসবে।

পথে চলে যেতে যেতে কোথা কোন্‌খানে
তোমার পরশ আসে কখন কে জানে॥
কী অচেনা কুসুমের গন্ধে,
কী গোপন আপন আনন্দে,
কোন্ পথিকের কোন্ গানে॥

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

BANGLADARSHAN.COM

এরপরে আমার স্বর্গতা গর্ভধারিণীকে "পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ" বইটি আমি প্রায় জোর করে পড়ালাম মারা যাবার একবছর আগে, তার ফলে মা-বাবা দুজনেই রামকৃষ্ণ মিশনে যোগাযোগ করে স্বামী আত্মস্থানন্দজীর কাছে দীক্ষিত হন এবং খুবই শান্তি পান। তার আগে পর্যন্ত মা আমার কোনো কাজ ভালো চোখে দেখতেন না, কিন্তু এরপরে মা মারা যাবার আগে আমায় শুধু বলতেন, "তোর দেখিস খুবই ভালো হবে।" আমি কথাটার খুব গুরুত্ব দিইনি। তারপর ২০০৪-এর ফেব্রুয়ারী মাসে হঠাৎই মা চলে গেলেন। আমি স্বভাবতই খুব ভেঙে পড়েছিলাম এবং মায়ের এই আকস্মিক মৃত্যু আমাকে যেন জীবনবিমুখ করে টেনে নিল আধ্যাত্মিক জগতের দিকে।

"সহসা দারুণ দুখতাপে সকল ভুবন যবে কাঁপে,
সকল পথের ঘোচে চিহ্ন সকল বাঁধন যবে ছিন্ন
মৃত্যু-আঘাত লাগে প্রাণে—
তোমার পরশ আসে কখন কে জানে॥"

আমার শুধু মনে হত মানুষের মৃত্যুর পরে কি হয়? সেই চিরন্তন জন্মমৃত্যুর রহস্য ও জিজ্ঞাসা আমায় করে তুলেছিল অনন্তের প্রতি জিজ্ঞাসু ও মুমুক্ষু। থিয়েটার রোড অরবিন্দভবনের সদস্য ছিলামই, এবার সেখানকার আধাত্ম্য বিষয়ক বই আমায় টানতে লাগল।

একে একে বিভিন্ন বই পড়তে পড়তে উপলব্ধি করলাম সমর্থ গুরু বিনা আমায় সঠিক পন্থা আর কেউ দেখাতে পারবেন না। শুরু হল নানা জায়গায় আগত নানা সাধু মহাত্মার খোঁজ। আর্ট অফ লিভিংয়ের একদম শেষটা ছাড়া সব কটা কোর্স করলাম, আমিষ খাওয়া, চা খাওয়া সাময়িক ত্যাগ করলাম। সৎসঙ্গে যেতাম। কিন্তু আস্তে আস্তে বুঝতে পারলাম আর্ট অফ লিভিংয়ের সুদর্শন ক্রিয়া শরীর ভালো রাখবে বটে কিন্তু আধ্যাত্মিক উন্নতি হবে না। কি করা যায়?

অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকায়া
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রী গুরুবে নমঃ।

এমন সময় হাতে এলো "যোগীকথামৃত", অরবিন্দ ভবন থেকে নিয়ে তিরিশ পাতা পর্যন্ত পড়ে আবার ফেরত দিয়ে দিলাম। আমার বই পড়ার ব্যাপারে একটা বাজে অভ্যাস হল যে আমি যে পাতাটা অবধি পড়েছি সেই পাতাটা মুড়ে রেখে দিই। যোগীকথামৃতও তাই করেছি। এবার অন্তর্জাল দেখতে দেখতে একটা বই পেলাম ইংরেজিতে যেটার অনেক জায়গায় যোগীকথামৃতের উল্লেখ রয়েছে। অরবিন্দ ভবনে গিয়ে আবার যোগীকথামৃত চাইলাম, দেখলাম যে বইটা পেয়েছি সেটা সেই আগের নেওয়া বইটা কারণ সেই তিরিশ পাতাটা ভাঁজ করা রয়েছে। এবার আমি অবাক হলাম, কিন্তু ওই বইটা এতো পুরোনো যে পাতা গুলো হলুদ হয়ে ছাপা ঝাপসা হয়ে গেছে। বিরক্ত হয়ে বইটা কিনেই ফেললাম আর পড়লাম। ওখানে শেষের দিকে ক্রিয়াযোগ গুরু হিসেবে শ্রীঅশোককুমার চট্টোপাধ্যায়ের নাম, ঠিকানা ছিল। গিয়ে অশোকবাবুর সাথে দেখা করলাম। উনি ছমাস আমাদের দেখে তারপর আঠারোই মে, ২০০৮-এ আমাদের দীক্ষা দিলেন একসঙ্গে তিরিশ জনকে। কিন্তু দীক্ষা নেওয়ার দিন যাবার সময় আমাদের গাড়ি বিনা কারণে ধরে পুলিশ বড়ো কেস দিল, লাইসেন্স নিয়ে নিল যেটা ছাড়াতে বেশ কিছু অর্থদন্ড গেল। মনে একটা খটকা লাগল। তা ছাড়া গুরু রূপে ওঁকে যেন গ্রহণ করতে পারছিনা মন থেকে। তবু ক্রিয়া করে যাচ্ছি। মন যেন ঠিক ভরছে না। গেলাম এক তান্ত্রিকের কাছে, তিনি আমাদের তখুনি দীক্ষা দিয়ে দেন আর কি। আবার গেলাম এক লেখক গুরুর কাছে, শ্রীশুভাশিস গঙ্গোপাধ্যায় ও তাঁর বাবা শ্রীবিমলকুমার গঙ্গোপাধ্যায় (আসল নাম পরিবর্তিত), যাঁরা পূর্ণব্রহ্ম মহাত্মা বাবা লোকনাথ ব্রহ্মচারীর গুরু, শ্রী ভগবান গাঙ্গুলীর বংশের লোক আর তিনি ও তাঁর বাবা দুজনেই ক্রিয়া দেন, বললেন, "পাঁচ বছরের মধ্যে জ্যোতি দর্শন করিয়ে দেব", শুনলাম আর শুনে চলে এলাম। এবার গেলাম আর এক লেখকের কাছে, অগূঢ়ানন্দ (আসল নাম পরিবর্তিত), যিনি তখন অসুস্থ, প্রথমে বললেন মহাবতার বাবাজী এসে তাঁকে দীক্ষা দিয়ে গেছেন, তিনি বেশ কয়েকদিন ঘুরিয়ে স্বীকার করলেন যে দীক্ষা দেবার ক্ষমতা তাঁর নেই। পরে শুনেছিলাম আমাদের পরমগুরু শ্রীসরোজবাবার সঙ্গ করেছেন উনি, সরোজবাবার আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতাকে নিজের নাম দিয়ে চালিয়ে বেশ কিছু বই লেখেন কিন্তু জীবন্মুক্ত উচ্চকোটির মহাত্মা, আমাদের

BANGLADARSHAN.COM

পরমগুরু সরোজবাবা, যিনি রামকৃষ্ণদেবেরই সত্তা, যখন জানতে পারেন এইসব বইয়ের কথা, প্লেট ছুঁড়ে মারেন আর যেতে বারণ করেছিলেন তাঁকে, যার পরে অগূঢ়ানন্দবাবু সরোজবাবার সঙ্গ করা থেকে বিরত হন।

গুরু হলেন পরান বন্ধু পারের কান্ডারী
সুখের দিনে, দুখের দিনে সাথে থাকেন,
আলো যে আমি দেখি তারই।

গুরু বিনে রইব কেমনে,
গুরু হলেন অন্তর্যামী,
গুরু হলেন পরম দামী, জীবনে।

গুরু হলেন জ্ঞান প্রদীপ
গুরুই আবার মঙ্গলদ্বীপ
গুরু ছাড়া কি আর গতি কইব কেমনে?

গুরু হৃদে প্রেমের বাতি
গুরু ভগবানের জাতি
গুরু পরমের সাক্ষী ছাড়বি কেমনে,
এ জগতে গুরুই সার
মোক্ষপথের কর্ণধার
গুরু ছাড়া আর কি আছে, এ সংসারে বল দেখি।
বলেন লালন, “গুরুর চরণ পূজবি মনে মনে।”

—ফকির লালন সাইঁ

BANGLADARSHAN.COM

এর পরে একজন পরিচিত ভদ্রলোকের সঙ্গে একদিন কথা হচ্ছিল, কথা প্রসঙ্গে তিনি বললেন একবার তাঁর গুরুমায়ের কাছে যেতে, এই ভদ্রলোক বিগত চার বছর ধরে আমায় বলছেন তাঁর গুরুমায়ের কথা আর আমি তাঁকে খালি বলে যাচ্ছি যে এখনকার সব গুরু জাল, ভণ্ড। এবার যখন বললেন তিনি আমি যেতে রাজি হয়ে গেলাম, উনি সঙ্গে একজনকে দিলেন যিনি আমাদের সঙ্গে যাবেন। সেটা একটা রাসপূর্ণিমার দিন। আমরা সপরিবারে সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে গেলাম সেই আশ্রমে। যিনি সঙ্গে নিয়ে গেছেন রাস্তায় আমাদের বলে দিয়েছেন এগিয়ে গিয়ে যেন কথা না বলি আর কোনো প্রশ্ন যেন না করি ওঁর গুরুমাকে। যাইহোক, গিয়ে আশ্রমে পৌঁছলাম, একটু পরে ওঁর গুরুমা আর সতীর্থরা এসে বসলেন এবং রাসপূর্ণিমা উপলক্ষে গানের অনুষ্ঠান শুরু হল, বসে শুনলাম। এবারে সকলে একে একে গিয়ে প্রণাম করছে লাইনে দাঁড়িয়ে, আমরাও দাঁড়ালাম, যখন সামনে গিয়ে প্রণাম করছি, তখন গুরুমা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন যে কোথা থেকে এসেছি, সঙ্গে কে কে আছে, কার সঙ্গে এসেছি। গুরুমায়ের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে জানতে চাইলাম উনি আলাদা দেখা

করেন কিনা এবং কিভাবে। উনি বললেন যে দেখা করেন, আর আমাদের ফোনে জেনে নিয়ে যেদিন দেখা করেন সেদিন আবার যেতে বললেন। আমরা প্রণাম করে বেরোলাম, বেরিয়ে আমার কর্তাকে বললাম যে আর কোথাও যাবার নেই আমার, যাঁকে যেভাবে খুঁজছিলাম পেয়ে গেছি। যদিও সেই দিন মায়ের সম্পর্কে কিচ্ছু জানতাম না।

এই লভিনু সঙ্গ তব, সুন্দর হে সুন্দর!
পুণ্য হল অঙ্গ মম, ধন্য হল অন্তর
সুন্দর হে সুন্দর॥
আলোকে মোর চক্ষুদুটি মুগ্ধ হয়ে উঠল ফুটি,
হৃদ্‌গগনে পবন হল সৌরভেতে মন্থর
সুন্দর হে সুন্দর॥
এই তোমারি পরশরাগে চিত্ত হল রঞ্জিত,
এই তোমারি মিলনসুধা রইল পাশে সঞ্চিত।
তোমার মাঝে এমনি ক'রে নবীন করি লও যে মোরে
এই জনমে ঘটালে মোর জন্ম-জনমান্তর
সুন্দর হে সুন্দর॥

BANGLADARSHAN.COM

কি দেখেছিলাম আমি সেদিন? আমার মায়ের মৃত্যু আমি বহুদিন পর্যন্ত মেনে নিতে পারিনি মন থেকে, তাঁর অভাব আমার সবসময় অনুভূত হত, একটা ভীষণ শূন্যতা বোধে আক্রান্ত হতাম আমি। কারণ মা আমার শুধুই মা ছিলেন না, ছিলেন আমার সঙ্গী, সচিব, বন্ধু, পথের দিশারী, কড়া সমালোচক, ভরসাস্থল আবার আত্মার আত্মীয়। আর আমার ইষ্টদেবীমূর্তি মা দূর্গা, প্রিয় সঙ্গীত শ্যামাসংগীত, ভজন, রবীন্দ্রসংগীত।

"জ্যোতির্ময়ং নিত্য আনন্দমূর্তিং
সংসারসারং হৃদয়েশ্বরঞ্চ
বিজ্ঞানরূপং সকলার্তিনাশং
শ্রীগুরুদেবং সততং নমামি।"

সেদিন ওই আশ্রমে ওই সোনার বরণ কোমল জ্যোতির্ময়ী মঙ্গলমূর্তি গুরুমাকে দেখে মনে হয়েছিল দেবী দূর্গা স্বয়ং তাঁর বাহন, অসুর আর দশহাতের দশপ্রহড়ণ ছেড়ে দ্বিভূজা মানবী রূপে এসে দাঁড়িয়েছেন আর নিত্যসিদ্ধা মায়ের সঙ্গে কথা বলে সেই পরম ভরসাস্থল এক অভয়দায়িনী, মঙ্গলময়ী, আত্মার আত্মীয় বলে অনুভূত হয়েছিল। শুধু তাঁর অমৃতবর্ষী কথা আর অহেতুকী করুণায় তিনি আমার হৃদয়াকাশে নিজের আসনটি স্থায়ী করে এঁকে নিলেন। যেন আমার জন্মজন্মান্তরের জননী, স্বয়ং মা পরমাপ্রকৃতি সদ্গুরুরূপে আমার জীবনের আশীর্বাদ হয়ে এসেছেন।

ধায় যেন মোর সকল ভালোবাসা
প্রভু তোমার পানে, তোমার পানে, তোমার পানে।
যায় যেন মোর সকল গভীর আশা
প্রভু তোমার কানে, তোমার কানে, তোমার কানে।

চিত্ত মম যখন যেথা থাকে
সাড়া যেন দেয় সে তব ডাকে,
যত বাঁধন সব টুটে গো যেন
প্রভু তোমার টানে, তোমার টানে, তোমার টানে।

বাহিরের এই ভিক্ষা-ভরা থালি
এবার যেন নিঃশেষে হয় খালি,
অন্তর মোর গোপনে যায় ভরে
প্রভু তোমার দানে, তোমার দানে, তোমার দানে।
হে বন্ধু মোর, হে অন্তরতর,
এ জীবনে যা-কিছু সুন্দর
সকলই আজ বেজে উঠুক সুরে
প্রভু তোমার গানে, তোমার গানে, তোমার গানে।

BANGLADARSHAN.COM

পরে আমাদের সপরিবারে দীক্ষা দিয়েছেন উনি পুরশ্চরণ করে, দীক্ষার সময় বুঝেছি কেন আগের বার অশোকবাবুর কাছে দীক্ষায় ফাঁক ছিল কারণ উনি শক্তিপাত করে ঈক্ষন দান করেননি, যেহেতু ওঁর ওই ক্ষমতা ছিল না। এই শক্তিপাত করেন বলেই মা একসঙ্গে দু তিনজনের বেশী দীক্ষা দেন না আর দীক্ষার সময়ে অনেকের শরীরের অনেক অবগুন মায়ের শরীরে চলে যায়, তাই মা অসুস্থ হন। আমাদের শ্রীশ্রীমায়ের দিব্য সান্নিধ্য লাভের সুযোগ হয়েছে, তাঁর লেখা পড়েছি, শ্রীশ্রীমায়ের সম্পর্কে একটু একটু জেনেছি, আমার কর্তা যিনি একজন একনিষ্ট সংগীতজ্ঞ, তিনি ওঁর সঙ্গে বাজাতে সুযোগ পেয়েছেন। আমি আর আমার মেয়ে সুযোগ পেয়েছি শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে গানের দলে গান গাইবার এবং শ্রীশ্রীমায়ের অকাতর কৃপা লাভের। শ্রীশ্রীমায়ের লোককল্যাণের ও সাধুসেবার মহান ব্রত দেখেছি, মাকে কাছ থেকে দেখেছি, মায়ের ঐশীশক্তি বাদ দিলেও সবার প্রতি মায়ের অনাবিল স্নেহ ও করুণা প্রত্যক্ষ করেছি, অকৃপণ মমতা ও দয়া দেখেছি, জীবনের যে কোনো সমস্যার সমাধানে সুপরামর্শে মাকে সর্বদা পাশে পেয়েছি, মায়ের সুচারু ব্যবস্থাপনায় ভগবদ্গীতা, উপনিষদ, পতঞ্জলি যোগ দর্শন জানার, বোঝার এবং এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন ব্যাখ্যা জানার সুযোগ হয়েছে। মায়ের নিজের নানাবিধ সাংসারিক ও আশ্রমের ব্যবস্থা সত্বেও মা মায়ের সন্তানদের জন্য সতত বিরাজিত এবং সর্বদা পথ প্রদর্শক। অথচ জাগতিক সব কিছুতে মা কি অদ্ভুত নির্লিপ্ত, নিস্পৃহ! কত বস্ত্র, বস্তু, অর্থ মা অকাতরে দান

করেন শুধু মানুষের মঙ্গলার্থে, কত লোককে গোপনে সাহায্য করেন। অন্নপূর্ণা পুজোয় মা বাচ্ছাদের নিজের পরিবেশন করেন যাতে ভবিষ্যতে তাদের অন্নকষ্টে না ভুগতে হয়।

আমার মেয়ের দীক্ষা, মা বলেছিলেন পরে দেবেন, দীক্ষার আগের দিন আশ্রমের সংযুক্তাদির মাধ্যমে মা বলেন দীক্ষার জন্য মেয়েকে নিয়ে যেতে এবং আমাদের সাথেই ওর দীক্ষা হল। এক কথায়, আমাদের জীবন দর্শনের গতিপথ ওঁর সান্নিধ্যে পাল্টে গেছে আর জীবনের মানেটা পুরোপুরি ঈশ্বরমুখী ও গুরুনির্দিষ্ট হয়েছে। এখন উপলব্ধি করি, ঈশ্বরের ইচ্ছামাত্রেণ যা হয় তা সদ্গুরুর মধ্যে দিয়ে হয় আর তাই সদ্গুরু আর ঈশ্বর এক ও অভিন্ন। মায়ের সান্নিধ্যে আমরা চিনেছি গুরু নানকজীকে, মহাত্মা রামঠাকুরকে, মহাত্মা অভয়জীকে, প্রভু জগদ্বন্ধুকে, শিরডি সাইঁবাবাকে, সন্ত কবীরজীকে, সন্ত রুইদাসজীকে, দেওরাহাবাবাকে, হংসবাবাকে, নাঙ্গাবাবাকে, শিবতেজাবাবাকে এবং আরো অনেক উচ্চকোটির মহাত্মাকে, দর্শন করেছি মহাত্মা রাজেশ্বরানন্দজীকে, উদাসীবাবাকে, পুষ্করের মৌনী টাটবাবাকে, টাটবাবার গুরুদেব বড়ে টাটবাবাকে আর মায়ের কাছে শিখেছি অতুলনীয় গুরুভক্তি আর গুরুমহারাজদের প্রতি অটল শরণাগতি। আর সবচেয়ে বড়ো কথা, জেনেছি মায়ের নিজের মুখ থেকে, মহাত্মাদের মুখ থেকে এবং অন্যান্য বই থেকে, যে মা হলেন সারদা মায়ের সত্তা, তাঁর পরের জন্ম। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব ও সারদা মা এই জন্মে আমাদের এই ভাবে কৃপা করেছেন। মায়ের কাছে জেনেছি গুরুমহারাজরা এবং উচ্চকোটির মহাত্মারা শুধুই ছবি নন, তাঁরা সদা জাগ্রত এবং পরম কারুণিক।

BANGLADARSHAN.COM

“ধ্যান মূলম গুরুমূর্তি পূজা মূলম গুরুপদম।
মন্ত্র মূলম গুরু বাক্যম, মোক্ষ মূলম গুরু কৃপা।”

আমার জীবনের খুব ভালো হবার যে আশীর্বাদ আমার গর্ভধারিণী মা করেছিলেন, সেই খুব ভালোটা অবশ্যই সদ্গুরুরূপী শ্রীশ্রী মা সর্বাণীর কাছে সপরিবারে আশ্রয় লাভ। এর চেয়ে ভালো আমার মতো অকৃতি, অধমের জীবনের আর কিছু হবার নেই।

ওই আসনতলের মাটির পরে লুটিয়ে রব।
তোমার চরণ-ধুলায় ধুলায় ধূসর হব।
কেন আমায় মান দিয়ে আর দূরে রাখ,
চিরজনম এমন করে ভুলিয়ো নাকো,
অসম্মানে আনো টেনে পায়ে তব।
তোমার চরণ-ধুলায় ধুলায় ধূসর হব॥
আমি তোমার যাত্রীদলের রব পিছে,
স্থান দিয়ো হে আমায় তুমি সবার নীচে।
প্রসাদ লাগি কত লোকে আসে ধেয়ে,

আমি কিছুই চাইব না তো রইব চেয়ে;
সবার শেষে বাকি যা রয় তাহাই লব।
তোমার চরণ-ধুলায় ধুলায় ধূসর হব॥

আজি প্রণমি তোমারে চলিব দেবী
সংসার কাজে,
তুমি আমার নয়নে
নয়ন রেখো অন্তর মাঝে

গুরু প্রণাম:

গুরু প্রশান্তম ভবভীতি নাশম
শ্রী গুরু দেবম নিতরং নমামী।

তা বলে এই নয় যে আমাদের জীবনে সমস্যা নেই, অবশ্যই আছে, কিন্তু সদ্গুরুকৃপায় ও প্রসাদগুণে সেটা সঠিক পন্থায় কাটিয়ে ওঠাও আছে। সেই প্রসঙ্গে কিছু ঘটনা বলব।

মাকে প্রথম দেখার পরে বহুদিন মনে শুধুই ঘুরে ফিরে আসে মায়ের কথা, মায়ের অভয় মূর্তি, মায়ের মুখটা। এমন হত উঠতে বসতে খেতে শুতে সব সময় যেন একটা ঘোরের মধ্যে আছি, শুধু মায়ের কথা ভেবে চলেছি, প্রত্যেক দ্বিতীয় চিন্তাটা মায়ের বিষয়ে, রাত্রে শুয়েও গোটা রাত শুধু মাকে স্বপ্নে দেখেছি। এক এক সময়ে ভেবেছি এমন কেন হচ্ছে? কতো লোকের সঙ্গেই তো জীবনে দেখা হয়েছে, এইরকম তো কখনো হয়নি। আচ্ছা আমি যে মাকে নিয়ে এতো ভাবছি, উনি কি আমাকে নিয়ে একটুও ভাবেন? একদিন এই চিন্তা নিয়েই মায়ের কাছে গেছি, মাকে কিছু বলিনি, দেখি মা হঠাৎ বললেন, “শুধু কি তোমরাই আমার কথা ভাব, আমিও তোমাদের কথা ভাবি, তাই তো আমাকে তোমরা স্বপ্নে দেখ।” শুনেই চমকে তাকিয়ে দেখি মা কথাগুলো বলছেন আমার দিকে চেয়ে।

BANGLADARSHAN.COM

গুরু পরম ধন, অমূল্য রতন
রাখরে হৃদয়ে ধরি, করি সযতন।
বিশ্বব্যাপ্ত যিনি, গুরু পরশমনি
গুরু তিমির অজ্ঞান নাশন।

যাবৎ থাকে জ্ঞান, তাবৎ কর ধ্যান
সহস্রারোপরে গুরু জ্যোতিস্মান,
গুরু ওমকার পরম শিব জ্ঞান
সদ্গুরু সদা করেন অভয়দান।

শ্রীগুরুর সেবা নিত্য করে যেবা
আত্মগুরু পূজো হৃদয় গভীরে
গুরু সর্বব্যাপী গুরু দিব্যনাম
গুরুকৃপা লাভে কর মুক্তিস্নান।

–শ্রীশ্রীমা সর্বাণী

আমাদের দীক্ষার দিনে নিজেদের কথা বলতে গিয়ে মাকে আমার বাবার কথা বলেছিলাম, আমার বাবা আমার মায়ের আকস্মিক মৃত্যুর পড়ে ভীষণ অসংলগ্ন আচরণ করতে আরম্ভ করেন, যে কারণে আমার আর আমার বোনের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আমরা দূর থেকেই তাঁর খোঁজখবর নিয়ে দেখাশোনা করছিলাম, এমন সময় ২০১১ সালের অগাস্ট মাসে খবর পাই বাবা চার পাঁচদিন বাড়ি থেকে বেরোননি, কোনো সাড়া শব্দও নেই দেখে আশে পাশের লোক দরজা ভাঙতে চাইছেন আমাদের উপস্থিতিতে। আমরা গেলাম, দরজা ভাঙার পরে দেখা গেল বাবা বাথরুমে পড়ে আছেন, শেষের তিনদিন অজ্ঞান হয়ে ওভাবেই পড়ে ছিলেন। তাঁকে নিয়ে গাড়িতে করে কলকাতার সব হাসপাতালে ঘুরলাম, কোথাও ভর্তি করল না, ফিরে এসে পরেরদিন কাউন্সিলারের চিঠি নিয়ে শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে ভর্তি করলাম। বাবার কোমরে চোট লেগেছিল, তাই টানা দু বছর ওখানে ভর্তি ছিলেন আর ওখানেই পরে মারা যান। মাকে দীক্ষার দিনে বাবা যে ওভাবে হাসপাতালে রয়েছেন জানাই খুবই দুশ্চিন্তা নিয়ে। দীক্ষার পরে গুরুপূর্ণিমার অনুষ্ঠানের আগে একদিন সকালে বোন ফোনে জানায় বাবার শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, ঠিক হয় পরেরদিন গিয়ে প্রয়োজনীয় টাকা পয়সা জমা দিয়ে ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলা হবে।

BANGLADARSHAN.COM

পরেরদিনই হাসপাতাল থেকে জানায় বাবা মারা গেছেন সকাল সাতটায়। আমরা গিয়ে দেহ নিয়ে কেওড়াতলা শ্মশানে গিয়ে দাহ করি, সমস্ত প্রক্রিয়াটা অদ্ভুত মসৃণ ভাবে সম্পন্ন হয়। সেদিনই বিকেলে গানের ক্লাস ছিল, আমি যেতে পারিনি, কর্তা যায় এবং মাকে জানায়, মা শুধু বলেন, “পম্পা তাহলে তাড়াতাড়িই রেহাই পেয়ে গেল বল দায়িত্ব থেকে।” আর পরেরদিন অনুষ্ঠানে আমি বসতে পারি কিনা জানতে চাইলে সঙ্গে সঙ্গে সম্মতি দেন। আমার কর্তা সেদিন বাড়ি এসে বললেন যে মা যেন জানতেন এই ঘটনাটা আগে থেকেই, তাই খুব স্বাভাবিক ভাবেই বললেন কথাটা। আমি সেই প্রথম আশ্রমের অনুষ্ঠানে অংশ নিলাম এবং ওই পরিস্থিতিতেও গান করলাম।

একবছর পুজোর সময়ে আশ্রমে ঠাকুরের ছবি তোলা নিয়ে অন্য গুরু ভাইবোনদের সাথে একটু মনোমালিন্য হয়, আমার কর্তা খুব আঘাত পেয়ে ঠিক করেন যে আর আশ্রমে যাবেন না। পুজো শেষ হল, মাসখানেক পরে একদিন প্রণাম জানাতে আমি ফোন করলে আশ্রমের সংযুক্তাদি আমাদের বলেন যে মা ডেকেছেন, আমরা যেন যাই। যেদিন গেলাম সেদিন জগদ্ধাত্রী পুজোর অষ্টমী, ঘরে অনেক লোক ছিল, মা ঢুকলেন আমরা মাকে পুজোতে যে শাড়ি দিয়েছিলাম সেইটা পরে। ঢুকতেই সকলে বেরিয়ে গেল, মা বসে বললেন, “আমি বললাম যে আজকে পম্পার দেওয়া শাড়িটা দে, ভালো দিন আজ, পরি।” তারপরে আমাদের দিকে চেয়ে বললেন, “তোমরা আমার ঘরের লোক, অন্তরঙ্গ জন, তোমরা যখন খুশি আসবে, আমারো তোমাদের দেখতে ইচ্ছে

করে।” আমি তো কেঁদেই ফেলেছি আর কর্তার মুখে অপার প্রশান্তি। আত্মজনের মর্যাদা দিয়ে মা আমাদের যে স্থান নির্দেশ করেছেন, তার কোনো তুলনা নেই।

আশ্রমে একবার সারদা মায়ের জন্মোৎসবে সারদা-রামকৃষ্ণ হোটোর আশ্রমের সন্ন্যাসিনী মায়েদের সঙ্গেই এসেছেন ওখানকার মেয়েদের গানের শিক্ষিকা। ঐদিন আমাদের মাকে আমরা পায়ে ফুল দিয়ে থাকি, হোটোর আশ্রমের সন্ন্যাসিনী মায়েরা মাকে ঐদিন পুজো করেন, পঞ্চ প্রদীপ দিয়ে আরতি করেন, সেদিন ওঁরা পুজো করার পরে আমরা মায়ের পায়ে ফুল দিয়েছি, সেই শিক্ষিকা মহিলাও ফুল দিলেন লাইনে দাঁড়িয়ে, তারপর ওই আশ্রমের মেয়েরা অনুষ্ঠান করল, গান গাইল। মায়ের পায়ে এই ফুল দেওয়া আর পুজো করার গোটা সময়টা মা সমাধিতে ছিলেন। অনুষ্ঠান শেষে মা ওই শিক্ষিকা ভদ্রমহিলার সঙ্গে আলাদা করে কথা বললেন। আমরা বেরোবার সময়ে আশ্রমের এক দিদি বললেন যে আমরা যেন ওই গানের শিক্ষিকাকে একটু আমাদের গাড়িতে এগিয়ে দিই। তাঁকে নিয়ে গাড়িতে উঠলাম, তিনি উঠেই আমাকে জিজ্ঞেস করলেন যে কেন একজন সাধারণ গৃহস্থ মহিলাকে আমরা পুজো করলাম, কেন তাঁকে মা বলছে সকলে। আমি বললাম যে উনি আমাদের গুরু তো বটেই, উনি আমাদের সবারই মা আর তাঁকে বলেছিলাম, “এই যে আপনি আজ আমাদের সঙ্গে যাচ্ছেন, সেটা মায়েরই ইচ্ছেতে যাচ্ছেন।” উনি বললেন যে উনি বারুইপুরে থাকেন, ওঁর মেয়ের কদিন ধরে খুব জ্বর, তাকে সেই অবস্থায় রেখে এসেছেন, তাই তাঁর ফেরার তাড়া রয়েছে। আমি বলেছিলাম তাঁকে, “আপনি নিশ্চিন্তে যান, মা আপনার সঙ্গে আছেন, আপনি দেখবেন আপনার কোনো অসুবিধে হবে না রাস্তায়, আপনি বাড়ি পৌঁছে আমাকে একটা ফোন করে দেবেন।” তিনি বেহালা ট্রামডিপোতে নামলেন পৌনে নটায়। রাত্রি দশটায় আমায় ফোন করে বললেন যে তিনি পৌঁছে গেছেন বারুইপুরে তাঁর বাড়িতে। পরে যেদিন মায়ের কাছে গেছি হঠাৎ মা বলতে আরম্ভ করলেন, “সেদিন ওই ভদ্রমহিলা যখন দেখলেন সবাই ফুল দিচ্ছে, উনি খুবই অনিচ্ছা নিয়ে ফুল দিলেন আর মনে মনে ভাবছিলেন এক সাধারণ মহিলার পায়ে কেন ফুল দিয়ে প্রণাম করতে হবে? কিন্তু তারপর কি হয়েছে জান, উনি হোটোর আশ্রমের মায়েদের কাছে নিজে গিয়ে বলেছেন উনি খুব অন্যায় আচরণ করেছেন সেদিন এবং তাঁদের অনুরোধ করেছেন ওঁকে একবার আমার কাছে নিয়ে আসতে ক্ষমা চাইবার জন্য।” আমি শুনে আশ্চর্য হলাম, কারণ ওই ভদ্রমহিলার বিরূপ মনোভাব আমি দেখেছিলাম কিন্তু প্রকাশ করিনি, মা এই কথা বলার পরে মাকে বললাম সেদিনের ঘটনা পুরোটা। মা শুনে হাসলেন। এটা আরেকটা ঘটনা।

BANGLADARSHAN.COM

একবার ক্রিয়া দেখাতে গেছি আমরা মায়ের কাছে সকালবেলায় মানে বেলা বারটা নাগাদ। গিয়ে বসে থাকার একটু পরে মা এলেন, এসে বললেন, “আমি দেখলাম তোমরা গাড়িতে উঠছ, তখনই মনে পড়ল তোমাদের আসতে বলেছি, তাই তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নিচে এলাম।” মা বারবার বলেন, “কেউ যদি মা বলে এসে আমার হাত ধরে, আমি তার হাতটা ধরে থাকি সবসময়, যদি না সে নিজে থেকে হাতটা ছাড়িয়ে নেয়।” মায়ের গণেশ যজ্ঞের আগে সেবছর মা শীতকালে পুরী যেতে পারেননি, আমরা যাচ্ছি শুনে মা আমার কর্তাকে বললেন জগন্নাথ মন্দিরে ধ্বজা দিতে যেটা গণেশ যজ্ঞের আগে দিয়ে যজ্ঞ শুরু করবেন মা, তার জন্য টাকাও মা দিয়ে

দিলেন। ওখানে গিয়ে ধ্বজা তোলার আগে ফোনে মাকে জিজ্ঞেস করে নেওয়া হল ঠিক কি করতে হবে। পুরীতে সেই প্রথমবার আমরা ধ্বজা তোলা দেখলাম আবার এনেও দিয়েছিলাম মাকে।

আমার মেয়ের বারো ক্লাসের ফাইনালের আগে মায়ের কাছে নিয়ে গেছি দেখা করাতে, ও খুবই চিন্তিত কেমন হবে সেই পরীক্ষা সেই ব্যাপারে। মা এসে ওর সঙ্গেই কথা বলতে বলতে বললেন, "তোর খুবই ভালো রেজাল্ট হবে দেখবি।" রেজাল্ট বেরোনোর পরে দেখা গেল ও ৯৪% মার্কস নিয়ে ওদের স্কুলের টপার হয়েছে। আমার মেয়ে খুব অন্তর্মুখী স্বভাবের, আবার ভীষণ নির্লিপ্ত। একবার মা কোন একটি অনুষ্ঠানের পরে চকলেট ছুঁড়ছিলেন সবার মধ্যে, সবাই হুড়োহুড়ি করে কুড়োচ্ছে, মেয়ের পায়ের কাছে পড়েছে চকলেট, একজন বয়স্কা মহিলা সেটার জন্য হাতড়াচ্ছে দেখে ও নিজেই তুলে ঐ মহিলার হাতে দিয়ে দিয়েছে, মা দেখতে পেয়ে মেয়েকে কাছে ডাকলেন আর ওর হাতে নিজে হাতে করে চকলেট দিলেন, কারণ মা জানেন আমার মেয়ে কেড়ে কোনো জিনিস নিতে শেখেনি আর মায়ের মতো আমার মেয়েও যে চকলেট ভালোবাসে, মা সেটা বিলক্ষণ জানেন। কতবার মা বাচ্ছাদের ক্যাডবেরি দেওয়ার সময় আমার মেয়েকেও ডেকে ক্যাডবেরি দিয়েছেন।

আমার ছোট বোনের শ্বশুরবাড়ি ও বরকে নিয়ে কিছু সমস্যা আছে, মাকে বলেওছি সেকথা। মা আমাদের এতো স্নেহ করেন যে শুধু আমার বোন বলে আমার বোনের সঙ্গে আলাদা কথা বলেছেন, ওকে অভয় দিয়েছেন, সাহস জুগিয়েছেন বারবার, ওর ছেলের একটা ফাঁড়া ছিল, সেটা কাটাতে মা ক্রিয়াকর্ম করে ওকে মাদুলি করে দিয়েছেন নিরখরচায়, যে মাদুলি বাইরে করতে হলে ওকে বেশ কিছু টাকা খরচা করতে হত।

BANGLADARSHAN.COM

আমার কর্তার অফিসে বহুদিন ধরে ওকে প্রমোশন না দিয়ে নানাভাবে অসুবিধের সৃষ্টি করছিল, হঠাৎ কোম্পানি TCS টেক ওভার করল, হ্যান্ডওভারের ঠিক আগের দিন ওর প্রমোশন হল, কেউ জানেনা কে রেকমেন্ড করল আর একমাত্র ওকেই খুব সম্মানীয় জায়গায় বসাল TCS, কারণ ও ব্যক্তিগতভাবে ভীষণ আত্মমর্যাদা সম্পন্ন মানুষ। আমরা উপলব্ধি করলাম পরোক্ষে কার মঙ্গলহস্ত কাজ করছে। আমার কর্তা ইউরিক অ্যাসিডের সমস্যায় খুবই কষ্ট পান, হাতের পায়ের গাঁট ফুলে গিয়ে জ্বর এসে যায়, আর এটা হয় প্রতি সপ্তাহে, মাকে জানাতে মা বললেন যে মৌরী ভিজিয়ে জল খেতে সকালে খালি পেটে আর হোমিওপ্যাথি ওষুধ বলে দিলেন খেতে। মায়ের কৃপাতেই এখন সেটা অনেকটা সামলেছে।

মায়ের শ্রীক্ষেত্র পুরীতে একটা বাড়ি আছে, সাধারণত শীতকালে মা সেখানে গিয়ে থাকেন। আমাদের শাস্ত্রে বলে শ্রীক্ষেত্রে গুরু দর্শন জগন্নাথ দর্শনের থেকেও হাজারগুণ পুণ্যের। আমার খুব ইচ্ছে ছিল একবার ওখানে মায়ের দর্শন করি, সেকথা মাকে জানিয়েছিলাম। সেবার আমরা পুরী গেছি, শুনে গেলাম মাও যাচ্ছেন পুরী কিন্তু আমরা যখন ফিরে আসবো সেই সময়ে। যাই হোক, আমাদের ফিরে আসার আগের দিন সন্ধ্যেবেলায় আমাদের আশ্রমের এক দাদা ফোন করলেন, বললেন যে ওঁরা তখুনি পুরীতে পৌঁছেছেন, মা বলেছেন যে আমরা যেন আধ ঘণ্টার মধ্যে গিয়ে দেখা করি। ওঁরা ইতস্তত করছিলেন কারণ কলকাতা থেকে গাড়িতে এতটা

রাস্তা গিয়ে সবাই খুবই ক্লান্ত, কিন্তু মা বলেছেন আমাদের ডেকে নিতে। আমরা তো আপ্লুত, গেলাম সপরিবারে। মায়ের দর্শন হল, কথা হল, আমি আরেকবার অনুভব করলাম যে গুরু অন্তর্যামী আর গুরুকৃপা কিভাবে প্রাপ্ত হই আমরা। সেদিন আমরা অবশ্য আধঘণ্টার বেশি বসিনি কারণ মা সহ সকলে সেদিন খুবই ক্লান্ত ছিলেন দীর্ঘ পথশ্রমে। পরে মা সবার সামনে একদিন ওই প্রসঙ্গে কথাও বললেন।

সেবার আমার কর্তার কর্মক্ষেত্রে থেকে অবসরের আগে একটা কমপ্লিমেন্টারি ট্রিপে কেরালার মুন্নার যাবার কথা হল, ঠিক হল যাওয়া হবে অগাস্ট মাসে, সেই মত মাকে জিজ্ঞেস করে ফ্লাইটের টিকিট কাটা হল, হোটেল বুক করা হল। সব কিছু ঠিক। এর মধ্যে মায়ের সোয়াইল ফ্লু হয়েছে, মা ভীষণ অসুস্থ, ফুসফুসে ইনফেকশন হয়েছে ভালো মতন, মা বসছেন না, প্রায়দুয়েক মা উঠতে পারেননি, আমাদের সকলের খুব মনখারাপ। যাবার দিন যেদিন ঠিক ছিল তার আগের সপ্তাহে আমরা গেছি, হঠাৎ মা উঠে এসে বসলেন, ঠিক এক ঘণ্টা ছিলেন, এসেই আমার কর্তাকে বললেন, “খুব বৃষ্টি হচ্ছে ঐদিকে এখন, যাবার আগে একটু খোঁজ নিয়ে যেও, না গেলেই ভালো এখন।” আমরা শুনে চুপচাপ বাড়ি এলাম, তার তিনদিনের মাথায় হেড অফিস থেকে ফোন করে জানাল যে কোচি এয়ারপোর্ট ডুবে গেছে, সব ফ্লাইট ক্যানসেল হয়েছে, আমাদের যাওয়াটাও পিছিয়ে দিচ্ছে ওরা, আমরা কবে যেতে পারব যেন জানিয়ে দিই, ওরা সেইমতো সব ব্যবস্থা করবে। মাকে জিজ্ঞেস করতে মা একদম কবে থেকে কবে সব বলে দিলেন, সেই মত আবার সব ঠিক হল। আমরা সেই মত ঘুরে এলাম, ফেরার সময়ে ত্রিবান্দ্রাম এয়ারপোর্টে যখন ঢুকছি তখনো সব ঠিক আছে, যখন প্লেনে উঠছি তখন বৃষ্টি পড়ছে ওখানে, তারপরে ব্যাঙ্গালোর এয়ারপোর্টেও বৃষ্টি পেলাম, প্লেন খুব ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে কলকাতায় এলো, কলকাতায় পৌঁছে গেলাম নির্বিঘ্নে। তারপরেই আবার প্রবল বর্ষণ শুরু হল ঐদিকে, আর কোচি এয়ারপোর্ট সকালের সব ফ্লাইট বন্ধ করে দিল মেন্টেনেন্সের জন্য। অথচ আমাদের সবচেয়ে সুন্দর প্রায় স্বপ্নের মত একটা ঘোরা হয়েছে মুন্নারের এই যাত্রাটা।

BANGLADARSHAN.COM

এমন একটা ভরসার জায়গা মা আমাদের তৈরী করে দিয়েছেন, যে শুধু তাঁকে স্মরণে আর কৃপার প্রসাদে, সব বাধা কেটে যায়। আমার আগে আগে খুব মনে হত তীর্থ করে পুণ্য অর্জন করব। বার বার কাশী, নর্মদার তট, বৈষ্ণোদেবী যাবার কথা মনে হত, একদিন মাকে সে কথা বলতে মা বললেন, “সকল তীর্থ সমন্বিত তীর্থসার হল গুরুর চরণ কমল, সেই গুরু চরণ দর্শনে সব তীর্থের ফল লাভ হয়, কোথাও যেতে হবে না তোমাদের, এখানে এসো।” বিন্ধ্যাচলের বিন্ধ্যবাসিনী দেখার কথা বলতে মা বলেছিলেন, “আমাকে দর্শন করলেই তোমার মহাকালী, মহালক্ষ্মী আর মহাসরস্বতী দর্শন হবে, কোথাও যেতে হবে না।” যাবার ইচ্ছেও আর হয়নি। মা কখনো নিজের একটি দর্শনের কথা বলেন যে হাতে ত্রিশূল নিয়ে মা দেখেছেন তিনি কৈলাশ থেকে নামছেন, নেমে দাঁড়ালেন হিমালয়ের কোনো গিরি কন্দরে সিংহবাহিনী হয়ে।

জ্ঞানগঞ্জে সূক্ষ্ম শরীরে আমাদের পরম গুরু সরোজবাবার সঙ্গে যাবার কথা, ওখানে যোগিনীমায়ের কাছে যাওয়া এসব মায়ের লেখা বইতেও আছে, মহাত্মা কুথমির কথা, জ্ঞানগঞ্জের জন্য কিছু অভিজ্ঞতা মা আমাদের অনেকবার বলেছেন।

“নয়ন আমার রূপের পুরে, সাধ মিটায়ে বেড়ায় ঘুরে
শ্রবণ আমার গভীর সুরে হয়েছে মগন।”

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গানের ক্লাসে বসে মা যে কতো রকমের গান কতো ভাবে শুনিয়েছেন, শিখিয়েছেন! শাস্ত্রীয় সংগীতের বিভিন্ন রাগ রাগিণীতে মায়ের এমন অনায়াস দখল আর যেকোনো ধরণের গান মা এতো অল্প আয়াসে আয়ত্ত করে ফেলেন, সে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতই হোক, রবীন্দ্রসংগীত নজরুলগীতিই হোক, ভজনই হোক আর ওয়েস্টার্ন ক্লাসিকাল সংই হোক–সবেতেই মা সতত স্বচ্ছন্দ। মায়ের নিজের কথা অনুসারে মা ভৈরবীতে সিদ্ধ, কিন্তু আমার ধারণা মা সকল সুরেই সিদ্ধ। গান করতে বসে প্রচণ্ড গরমে কষ্ট পাচ্ছি আমরা, মা মিঞামল্লার বা জয়জয়ন্তী গাইলেন, হঠাৎ মেঘের গুড়গুড় আওয়াজ পেলাম এবং তারপরে বৃষ্টি পড়া শুরু এইসব নিজের চোখে দেখা। ভীষণ অশান্ত মন মায়ের কাছে গিয়ে মায়ের গানে আর কথায় মনে নিবিড় শান্তি এলো এটা অনেকবার হয়েছে, আমার ধারণা আমাদের গুরুভাইবোনেদের অনেকেরই এই অভিজ্ঞতা আছে। মায়ের গান শুনতে শুনতে অনেকবার হয়েছে চোখ বন্ধ করে শুনছি, কিন্তু চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছে। এমন এক স্বর্গীয় সুষমা মণ্ডিত মায়ের গান যে তা যেন হৃদয়ের অন্তস্থলে গিয়ে অনুরণিত হয়, শোনার পরেও বহুসময় ধরে তার রেশ রয়ে যায়, সত্যি সত্যি মায়ের গান অপার্থিব। মায়ের ভাষায় মায়ের সংগীতে শ্রুতি আছে যা অন্তর্লোক আলোকিত করে। আমি সংগীতের আবহে বাস করি কারণ আমার কর্তা একজন সেতারি, বেহালাবাদক ও পিয়ানিস্ট, তাই বাড়ির আবহে সারাদিন সংগীতচর্চা চলছে এবং নিজেও সংগীতের গভীরে ঢোকার চেষ্টা করি ও গাই বলে সঙ্গীত আমার সত্তার অনেকখানি জুড়ে আছে। কিন্তু মায়ের গান শুনে আসার পরে বেশ কিছুদিন তা ঘুমের মধ্যেও কানে বাজতে থাকে।

BANGLADARSHAN.COM

“তোমার যজ্ঞে দিয়েছ ভার বাজাই আমি বাঁশি
গানে গানে গেঁথে বেড়াই প্রাণের কান্না হাসি।”

প্রথম দিকে আমরা যখন গেছি মায়ের কাছে, একদিন বেশ রাত হয়ে গেছে, প্রায় সবাই চলে গেছে, আমরা উঠব উঠব করছি, সেদিন মা হঠাৎ বললেন তোমরা একটু বস, বলে মা নিজের কিবোর্ডটা আনালেন আর আমার কর্তাকে বললেন বাজাতে। ও বাজানোর পরে মা বললেন, “জান তো অরিজিৎ, বাবাজী মহারাজ আমাকে বলেছেন একটা ছেলেকে পাঠাচ্ছি যে সব ধরণের ইনস্ট্রুমেন্ট বাজাতে পারে। তুমিই সেই ছেলে।” মাকে আমরা জিজ্ঞেস করেছিলাম আমাদের কাজ কি আশ্রমে, মা বললেন আমার কর্তাকে, “তুমি আমার সঙ্গে টুংটাং করে যেও, তাহলেই হবে।” আমার কর্তার একক বেহালা বাদনের প্রোগ্রাম মা করিয়েছেন যেখানে মা নিজে ওর সঙ্গে কীবোর্ড বাজিয়েছেন। আমাদের সঙ্গে তবলায় সঙ্গত করেন বিশিষ্ট তবলিয়া শান্তনুদা, শুনেছি শান্তনাদার আঙুলে একবার এমন সমস্যা হয়েছিল যে ওঁর বাজানো বন্ধ হয়ে গেছিল, মায়ের কৃপায় আর মায়ের সঙ্গে বাজাতে বাজাতে ওঁর হাত ঠিক হয়েছে।

প্রতি বছর পুজোতে মা আমাকে একটা শাড়ি দেন, এটা যে কতবড় প্রাপ্তি, আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। আমার লেখা স্তব মা সুর দিয়ে গেয়েছেন, আমার লেখা কবিতা মা ছাপিয়েছেন হিরণ্যগর্ভ পত্রিকাতে। মায়ের কাছে আমাদের যে কতখানি প্রাপ্তি বলে শেষ হবে না। আমার কর্তার কথায় আর সুরে করা গান মা গাইয়েছেন সকলকে আশ্রমের অনুষ্ঠানে।

বহুবার চাকরি করার জন্য মায়ের কাছে অনুমতি চেয়েছি, প্রতিবার মা একটাই উত্তর দিয়েছেন যে যা করার বাড়িতে বসে করতে হবে, আমাদের নাকি খাওয়া পরার অভাব কোনোদিন হবেনা কারণ আমাদের সেই ভাবে কোনো চাহিদা নেই। মা যে আমাদের এতো স্নেহ করেন, ভালোবাসেন এটা আমাদের সবচেয়ে বড়ো পাওনা। আমার কর্তার ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শেখা আর তার জন্য ঠিকঠাক সময়ে যথাযথ শিক্ষক পাওয়া এবং শিখে এগোন, সবটাই মায়ের কৃপায়। বহুবার ক্রিয়া নিয়ে মায়ের কাছে জানতে চেয়েছি যে আত্মদর্শন হবে কিনা, মা প্রতিবার আশ্বস্ত করেছেন যে নিশ্চয় হবে আর বারবার আশ্বাস দিয়েছেন যে কোনো চিন্তা নেই, মায়ের অনেক বড়ো নৌকো, মা মায়ের সন্তানদের তুলে নিয়ে চলে যাবেন। মায়ের এই অভয়া মূর্তি যেন সর্বদুঃখহর। মাকে অনুকরণ নয়, পূর্ণ শরণাগতি নিয়ে মাকে অনুসরণ করলে জীবনের অনেক সমস্যার সমাধান বেরিয়ে আসে। মায়ের অনেক কৃতি সন্তান, কিন্তু আমার একটাই মা। তাই মায়ের পায়ে রবিঠাকুরের ভাষায় প্রার্থনা করি:

সংশয়-তিমির মাঝে না হেরি গতি হে
প্রেম-আলোকে প্রকাশ' জগপতি হে॥
বিপদে সম্পদে থেকে না দূরে,
সতত বিরাজ হৃদয়-পুরে,
তোমা বিনে অনাথ আমি অতি হে।
মিছে আশা ল'য়ে সতত ভ্রান্ত,
তাই প্রতিদিন হতেচি শ্রান্ত,
তবু চঞ্চল বিষয়ে মতি হে–
নিবার' নিবার প্রাণের ক্রন্দন,
কাট হে কাট হে এ মায়া-বন্ধন,
রাখ রাখ চরণে এ মিনতি হে।

BANGLADARSHAN.COM

কিছু ঘটনার উল্লেখ করব, যাঁর আমরা প্রত্যক্ষদর্শী।
আমাদের একজন গুরুভগ্নী লোপাদি (আসল নাম পরিবর্তিত) আমাদের বাড়ির কাছে থাকেন, ওঁর স্বামী গত হয়েছেন বেশ কিছুদিন, একটি মেয়ে, উচ্চশিক্ষিতা। ওঁর মেয়ের চোখের কিছু সমস্যা ছিল, তার অপারেশন করালেন উনি, অপারেশনের আগের দিন আমার সাথে দেখা হতে পরেরদিন অপারেশন সেটা বললেন। আমি জানতে চাইলাম যে আমাদের গুরুভাই ও কলকাতার প্রথিতযশা রেটিনা স্পেশালিস্ট ডক্টর বরুণ দত্তকে উনি জানিয়েছেন কিনা, মাকে জানিয়েছেন কিনা। উনি বললেন যে উনি বিকল্প মতামত নিয়েছেন অন্য ডাক্তারের

কাছ থেকে আর মাকে জানানোর কোনো প্রয়োজন নেই বলে উনি মনে করেন। আমি আর কথা বাড়াইনি, চলে এলাম। এর ঠিক একমাস পরে হঠাৎ আমাদের আরেক গুরুভাই আমাকে বললেন যে লোপাদির মেয়ের ঐ অপারেশন করার পরে নার্ভের কিছু সমস্যা হচ্ছে, ঘুমোতে পারছে না, নিজের আর লোপাদির হাতপা আঁচড়ে দিচ্ছে নাকি। তারপরেই লোপাদি আমায় বললেন যে মেয়ের এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে উনি রাত্রে ঘুমোতে পারছেন না, শেষ একমাস মেয়েও ঘুমোয়নি, ওঁকেও ঘুমোতে দিচ্ছে না, মেয়েকে একা রেখেও বেরোতে ভয় পাচ্ছেন যদি মেয়ে কিছু করে বসে, মেয়ে চাকরিও ছেড়ে দিয়েছে এই কারণে। আমায় উনি এবং সেই গুরুভাই ভদ্রলোক দুজনেই অনুনয় করে বললেন একবার যেন মাকে বলি। পরে যেদিন মায়ের কাছে গেছি সেদিন শিবরাত্রি ছিল, আসার আগে মাকে বললাম, সংযুক্তাদি আমায় খুব বকুনি দিল কেন আমি এইসব কিছুতে জড়িয়েছি বলে। অদ্ভুত ব্যাপার, মাকে বলামাত্রই মা বললেন মা নাকি দেখেছেন লোপাদির একটা সমস্যা হচ্ছে। আশ্রম থেকে বেরোনোর আগে মা বলে দিলেন লোপাদিকে বলতে যে ওরা যেন টানা একমাস মায়ের ছবিতে রোজ একটা করে জবাফুল দেয়, তারপরে একমাস পরে মা দেখা করে নেবেন। আমি বাড়ি এসে রাত্রে ফোন করে লোপাদিকে বলতে আমায় লোপাদি খুবই বিরক্ত হয়ে বললেন যে রোজ রোজ জবাফুল জোগাড় উনি কিভাবে করবেন। আমি চুপ করে শুনে গেলাম। তার তিনদিন পরে লোপাদির মেয়ে আমায় ফোন করে বলল যে মায়ের নির্দেশ মত মায়ের ছবিতে জবাফুল দিয়ে ও এই কদিন রাত্রে ঘুমিয়েছে, আমি যেন একবার মায়ের ওর সঙ্গে দেখা করার কথা বলি মাকে। মাকে বললাম, মা দেখা করলেন এবং তিন মাসের মধ্যে দেখলাম মেয়েটা প্রায় সুস্থ।

BANGLADARSHAN.COM

একজন আশ্রমে আসতেন দেখেছি যিনি ক্যান্সার পেশেন্ট, কেমোথেরাপিতে সব চুল উঠে গেছে, মাথায় রুমাল বেঁধে আসতেন, আস্তে আস্তে তাকে দেখলাম সেরে উঠতে, এখন মাঝে মাঝে আসেন, একদম ভালো হয়ে গেছেন তিনি।

আমাদের আরেক গুরুভাই, যাঁর মাধ্যমে মায়ের সাথে যোগাযোগ, তিনি বলেছিলেন যে তাঁর বিয়ের দশ বছর পর্যন্ত কোনো সন্তান না হওয়াতে তিনি টানা একবছর রোজ মায়ের পায়ে আর মহাবতার বাবাজীর পায়ে ফুল দিতেন, একবছরের মধ্যেই তাঁর ছেলে হয়। আরেকজনকে জানি যাঁর বিয়ের পনের বছর পরে মায়ের কৃপায় যমজ সন্তান হয়েছে। একজন বিখ্যাত বড়ো ডাক্তার, তার স্ত্রীর প্রথমবার সন্তান হতে গিয়ে মিসক্যারেজ হয়ে যাওয়ার পরে ডাক্তার বলে দিয়েছিলেন তার আর বাচ্ছা হবে না, তার কিছুদিন আগে ছেলে হল।

লকডাউনের সময় মায়ের দর্শন আর সঙ্গ না পাওয়ায় খুব অস্থির হয়েছে মন, বারবার শুধু মন খারাপ লাগছে, এমন সময় মা দেখলাম প্রথমে একটা ভিডিও পাঠালেন, শুনলাম এটা মায়ের নিজের তত্বাবধানে বানানো, তারপরে আবার পয়লা বৈশাখে একটা ভিডিও পাঠালেন, গুরু পূর্ণিমাতে গুগল মিটে দর্শন দিয়ে অভয় দিলেন, জপ করতে বললেন, ঝুলন, জন্মাষ্টমী, গণেশ চতুর্থী, রাধাষ্টমী এইসব তিথিতে কিছু কিছু ছবি দেখলাম। অনুভব করলাম মায়ের স্নেহের আঁচল আমাদের সর্বদা ঢেকে রেখেছে সব অমঙ্গলের থেকে।

আমার বাবা মারা যাবার পরে দেখা যায় যে ওঁর টাকা পয়সার জন্যে কাউকে সঠিকভাবে উনি নমিনী করে যাননি। যেটুকু কাগজপত্র ছিল তাই নিয়ে ব্যাংক, পোস্টঅফিসে বা এলআইসিতে গেলে তাঁরা অনেক আইন কানুনের কথা বলে কোর্টের থেকে কিছু কাগজপত্র করিয়ে আনতে বলেন। সেগুলো দেবার পরে কিছু জায়গায় টাকা পেলেও স্টেটব্যাংক কিছুতেই টাকা দিচ্ছিল না, আমার বোন দু বছর ধরে যাতায়াত করেও যখন টাকা উদ্ধার হল না, আমাকে বলল যেতে। আমি গেলাম বোনকে নিয়ে, সার্ভিস ম্যানেজারের ঘরে ঢোকার আগে মাকে স্মরণ করে ঢুকলাম। ভদ্রলোক কথা বলে সেদিনই বললেন কোর্টের কাগজ তৈরী করে জমা দিতে, পরেরদিন দিলাম সেগুলো। ভদ্রলোক আমাদের বসতে বলে গেলেন ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের কাছে, একটু পরে ব্রাঞ্চ ম্যানেজার ডেকে পাঠালেন তাঁর ঘরে। যাওয়ার পরে বললেন ঠিক একসপ্তাহ পরে ঐদিন গিয়ে চেকটা নিয়ে আসতে। আমার বোন খুবই অবাক হয়ে আমায় জিজ্ঞেস করল, “কি হল বলত দিদি ব্যাপারটা?” আমি বললাম, “মায়ের কৃপা”।

২০১৭ সালের পুজো সবে শেষ হয়েছে তখন। আমরা অষ্টমীর সন্ধিপুজো আশ্রমে দেখে বাড়ি এসেছি। তারপর আর আশ্রমে যাওয়া হয়নি। একাদশীর দিনে আমি স্বপ্ন দেখলাম মাকে। দ্বাদশীর দিনে আবার দেখলাম রাত্রে, আমার কর্তাও দেখল। ত্রয়োদশীর দিনে সকালে আমাদের একজন গুরুভাই ফোন করে বলল যে মা আমাদের খুঁজছেন, পরেরদিন মানে সেটা কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোর আগের দিন সন্ধ্যার সময় মা একটু গান শোনাবেন মৌনী টাটবাবার গুরু বড়েটাটবাবাকে যিনি তখন আশ্রমে এসেছেন। পরেরদিন চৌঠা অক্টোবর, ২০১৭ সন্ধেবেলায় আমাদের সকলকে নিয়ে মা গান গাইলেন, বড়েটাটবাবা, যিনি এক সদানন্দময় পুরুষ এবং বয়স জনিত কারণে কানে একটু কম শোনেন, তন্ময় হয়ে গান শুনলেন। বড়েটাটবাবা আমাদের প্রত্যেকের মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করে বললেন, “আমি রাধারানীকে (মাকে) দর্শন করতে এসেছেন আর রাধারানী যেখানে অবস্থান করেন সেই স্থানই বৃন্দাবন, তোমরা সবাই বৃন্দাবনের গোপ-গোপিনী।” মাকে বললাম দুদিন ধরে আমাদের দুজনের ক্রমাগত মাকে স্বপ্নে দেখার কথা, মা বললেন, “হ্যাঁ, আমি তোমাদের খুব মনে করছিলাম খবর দেবার জন্যে।” মনে পড়লো মায়ের দেওয়া রামঠাকুরের জীবনের ওপরে লেখা বই “রামভাই স্মরণে” বইতে পড়েছিলাম, “গুরুদর্শন সর্বাবস্থায় সত্য, জাগ্রতাবস্থায় বা স্বপ্নে”, সেই কথাটি। পুস্করের মৌনী টাটবাবাকে আমরা মায়ের কৃপায় বেশ কয়েকবার দর্শন করেছি, তাঁর মুখে রামকথার প্রবচন শোনার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছে।

BANGLADARSHAN.COM

বাপ্পাদা মায়ের অনেকদিনের সন্তান। কিছু বছর আগে একদিন আশ্রমে গিয়ে মায়ের কাছে শুনলাম বাপ্পাদার গাড়ির এক্সিডেন্ট হয়েছে। গাড়িতে বাপ্পাদা, ওঁর স্ত্রী আর ছোট্ট মেয়ে ছিল, ছেলে ছিল আমাদের আশ্রমে। বাপ্পাদারা অনেক রাত্রে ফিরছিলেন, ড্রাইভ করতে করতে বাপ্পাদার চোখ লেগে যায়, সামনে বড়ো কোনো গাড়ি ছিল, বাপ্পাদার গাড়ি সোজা গিয়ে তাতে ধাক্কা মারে। মা বললেন, “কি করে যে ওরা বেঁচে গেল কে জানে।” পরে বাপ্পাদার সাথে দেখা হতে জানলাম যে ওঁদের গাড়িটার ভীষণ ক্ষতি হয়েছিল, কিন্তু বাপ্পাদার, ওঁর স্ত্রীর আর মেয়ের খুব সামান্য চোট লাগে যা ফার্স্ট এইড দিতে ঠিক হয়ে যায়। আরেকটা ঘটনা শুনেছিলাম,

স্বাতীদি আর তাঁর স্বামী বাইকে করে মেদিনীপুরের দিকে ওঁদের কোনো দরকারে গেছিলেন, একটা ব্রীজের ওপরে বাইক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সোজা জলে পড়ে, স্বাতীদির বরের চোট লাগে, স্বাতীদি জলে পড়ে তলিয়ে যাবার সময়ে মাকে স্মরণ করে, স্বাতীদি তখন অনুভব করে কেউ যেন ওঁকে ঠেলে ওপরের দিকে তুলে দিল। দুজনেই আশ্চর্যজনকভাবে বেঁচে যায়। এই ঘটনা স্বাতীদির মুখে শোনা।

আমার মেয়ের স্কুলে নাসার থেকে একজন প্যারা সাইকোলজিস্ট আসতেন ওদের কাউন্সেলিং করতে USA থেকে, এঁর নাম শ্রীমতী ডঃ সুষমা ত্রিবেদী। উনি আমার মেয়েকে খুবই স্নেহ করেন। এই ভদ্রমহিলার বেশী কিছু অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা আছে যেমন দূরদর্শন ইত্যাদি।

ক্লাস নাইনে শেষবার যখন উনি আসেন কলকাতায়, তখন আমার মেয়েকে বলেছিলেন যে মা স্বয়ং পরমাপ্রকৃতি, মা চেয়েছেন বলেই আমরা মায়ের কাছে যেতে পেরেছি এবং আমাদের মাথার ওপরে মায়ের কল্যাণহস্ত সতত বিরাজমান। আরেকজন ভদ্রলোক যিনি নিজে সাধনা করেন, নাম শ্রীশান্তময় পান্ডা, আমার কর্তাকে প্রথম দিন জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে আমার কর্তা কারুর দীক্ষিত কিনা, আমার কর্তা তাঁকে বলেছিলেন যে উনি দীক্ষিত, কার কাছে বা কোন যোগে কিছুই বিস্তারিত বলেননি। পরে যেদিন দেখা হয়েছে ওঁর সাথে আমার কর্তার উনি নিজে এগিয়ে এসে বলেছেন, “আপনারা তো দাদা স্বয়ং আদ্যা শক্তি মহামায়ার সন্তান, উনি তো আপনাদেরকে কোলে করে রেখেছেন।” মায়ের অমিত যোগৈশ্বর্যের কিছু কিছু মায়ের অনেক সন্তানই প্রত্যক্ষ করেছেন, মা সর্বদা নিজেকে প্রচ্ছন্ন রাখতে পছন্দ করেন। কখনো বাইরে থেকে কেউ এসে যখন বলেন কোনো সাধু বা মহাত্মার কাছে শুনে তাঁরা মায়ের কাছে এসেছেন, তখন বোঝা যায় মায়ের যোগবল আর সাধনশক্তি। যেমন একবার একটি পরিবারকে দেখেছিলাম যাঁরা আড়াইশো বছর বয়স্ক মহাত্মা বরফানী দাদাজী, যিনি সেই সময়ে নর্মদা তীরে অবস্থান করছিলেন, তাঁর কাছ থেকে মায়ের কথা শুনে মাকে দর্শন করতে এসেছেন।

BANGLADARSHAN.COM

এক বৃদ্ধ নিঃসন্তান দম্পতি মায়ের ছবি কোনো একজায়গায় দেখে তাতে প্রভাবিত হয়ে পুজো করতেন, পরে এক আত্মীয়ের বাড়িতে সেই আত্মীয়ের মেয়ের বিয়েতে এসে মায়ের সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ হয় এবং মায়ের কাছে দীক্ষিত হন, দীক্ষা পাবার এক বছরের মধ্যে ভদ্রলোক মারা যান, ভদ্রলোককে মা দীক্ষা দেবার পরে বলেছিলেন ওই ভদ্রলোকের সাধকের বংশে জন্ম এবং উনি আর খুব বেশী দিন নেই জেনেই মা দীক্ষা দিয়েছেন।

একবার আমার এক বান্ধবীকে নিয়ে গেছিলাম মায়ের কাছে মায়ের অনুমতি নিয়ে, মেয়েটি আমার স্কুলের ক্লাসমেট, আমার সঙ্গেই পড়ত। মা প্রথম দর্শনে ওকে দেখেই বললেন যে ও আমার চেয়ে বয়সে বড়ো। পরে ওকে জিজ্ঞেস করে জানলাম যে ও আমার চেয়ে তিন বছরের বড়ো। দ্বিতীয়দিন সে আবার আমার সঙ্গে গেছে মায়ের কাছে, খুব ইনিয়ে বিনিয়ে নিজের কথা বলছে, মা সব শুনে নিয়ে ওকে বললেন, “শোনো তুমি পম্পাকে ছেড়ে দাও, ও সংসারী মানুষ, এখানেও ওর কিছু দায়িত্ব আছে, ওর ঘাড়ে চড়ে এসো না, একা একা এসো।

তুমি তো কাছে থাকো, একা এসো, পম্পার সঙ্গে নয়।” পরে আমাকে বললেন মা “ওকে একটু দূরে রাখো, তোমার ট্রাবল বাড়বে”, পরে সেই কথার সত্যতা উপলব্ধি করেছি। আর তাই তাকে দূরেই রেখেছি।

লকডাউনের সময় লিখতে আরম্ভ করেছি নানা কথা, মাকে জানিয়েছি, ডিসেম্বর মাসে আবার মায়ের কাছে যাওয়া শুরু হল আবার, দ্বিতীয়দিন মাকে বললাম লেখার কথা, উনি আমার কর্তাকে বললেন, “এই সময়টা পম্পা তাহলে ভালো ভাবেই কাজে লাগিয়েছে বল।” মায়ের পক্ষেই সম্ভব এই ভাবে বলা কারণ মা আমাদের অন্তরটা স্বচ্ছভাবে পড়তে পারেন।

মায়ের সঙ্গে যাঁরা বেশী ঘনিষ্ঠ, তাঁদের মা সেই সুযোগটা দেন বলেই তাঁরা মায়ের ঘনিষ্ঠ। তাঁদের দিয়েই মায়ের বিভিন্ন কর্মযজ্ঞ সম্পাদিত হয়। তাঁদের মধ্যে অনেকেই বিভিন্ন গুণে গুণী মানুষ। তবে যাঁরা দূরে থাকেন, তাঁরাও মায়ের কৃপার পরশ পেয়ে কৃতার্থ বোধ করেন।

অখণ্ড মহাপীঠ আশ্রমে আমাদের গুরুমহারাজদের আসন প্রতিষ্ঠিত আছে, গুরুমহারাজরা সেখানে সতত বিরাজমান এবং জাগ্রত, কিন্তু আশ্রমের আসল সচল সচ্চিদানন্দময়ী প্রাণপ্রতিমা হচ্ছেন আমাদের মা যাঁর উপস্থিতি ছাড়া আশ্রম প্রাণহীন। আর আমাদের মত যাঁরা মায়ের কৃপার পরশের পরশমনি, অনাবিল আনন্দ প্রাপ্ত হয়েছি তাঁদের কাছে মা হচ্ছেন “জন্ম জন্মান্তরের মা”, যাঁর কাছে সর্বাবস্থায় সর্বকালে সবসময়েই আমরা শরণাগত, যাঁর প্রতি আমাদের আকুল শরণাগতি ও আন্তরিক প্রার্থনা ভবসাগর পার করার।

BANGLADARSHAN.COM

“শরণাগত দীনার্ত পরিত্রাণ পরায়ণে
সর্বস্যার্তি হরে গৌরী নারায়ণী নমস্তুতে।”

“অনাথস্য দীনস্য তৃষ্ণাতুরস্য
ক্ষুধার্তস্য ভীতস্য বদ্ধস্য জন্তো,
ত্বমেকা গতির্দেবী নিস্তারকর্ত্রী
নমস্তে জগত্তারিণী ত্রাহি দুর্গে।”

হরি ওঁম তৎ সৎ

॥মহাজীবনের পথে॥

সময়টা পঞ্চাশের দশকের। সদ্য ম্যাট্রিক পরীক্ষা শেষ হয়েছে। চোদ্দ বছরের ছেলে কমলের ম্যাট্রিক পরীক্ষা খুব একটা ভালো হয়নি, ওর ধারণা ও অঙ্কে পাশ করবে না। পিতৃহারা কমল মানুষ হয়েছে তার মামারবাড়িতে, মা আর দাদামশাইয়ের তত্ত্বাবধানে। মা অতিশয় ভক্তিমতী মহিলা। কমল মা অন্তপ্রাণ। মায়ের ইচ্ছে কমল এমন এক মানুষ তৈরী হোক যে থাকবে রাতের অন্ধকার আকাশে তারার মতো দেদীপ্যমান। তাই পরীক্ষা ভালো না হওয়াতে কমল খুব মুষড়ে পড়েছে মনে মনে। থাকে সে হাওড়ায়, মনের দোলাচলে সে ঠিক করতে পারছে না কি করবে।

ঠিক পরীক্ষার ফল প্রকাশের আগে আগে একদিন কমল অনেকক্ষন গঙ্গার ঘাটে পা ঝুলিয়ে বসে রইল। তারপরে সন্ধ্যা সমাগত দেখে গিয়ে ঢুকল হাওড়া স্টেশনে আর চড়ে বসল বেনারসগামী একটি ট্রেনে। যথাসময়ে ট্রেন ছাড়ল এবং ছুটে চলল রাতের অন্ধকারের বুক চিরে। কমলের পরনে হাফপ্যান্ট আর জামা, পকেটে আছে পনেরটি টাকা। আর কিছু নেই তার সঙ্গে, একেবারে একবস্ত্রে সে বাড়ি ছেড়েছে। সময় মতন ট্রেনে টিকিট চেকার উঠলেন, সকলের টিকিটও দেখলেন, কিন্তু কমলকে যেন দেখতেই পেলেন না, চলে গেলেন অন্য দিকে। কমল খুব অবাক হল বটে আবার নিশ্চিন্তও হল, স্বস্তিতে সেও ঘুমিয়ে পড়ল। বেশ কিছুক্ষন বাদে যখন তার ঘুম ভাঙল তখন এক রৌদ্রোজ্জ্বল সকাল। ট্রেন তখন বেনারস ঢুকছে, সে ট্রেন থেকে নেমে পড়ল। হেঁটে হেঁটে একে ওকে জিজ্ঞাসা করে গঙ্গার পাড়ে এসে দাঁড়াল, পতিতপাবনী পুণ্যতোয়া গঙ্গার পবিত্র শীতল ধারা নিয়ে মাথায় দিল সে, তারপরে নামল ঠান্ডা জলে স্নান করতে। শীতল জলধারায় স্নান কমলের যাত্রার ক্লান্তি অপনোদন করে দিল। স্নান করতে করতে তার কানে এল ঘাটের কিছু লোকজন আলোচনা করছে এক আশ্রমের ভান্ডারার। সেখানে নাকি আশ্রয় চাইলে আশ্রয়ও পাওয়া যাবে। কমল খুঁজে খুঁজে গিয়ে হাজির হল সেই আশ্রমে, দেখল লোকে লাইন দিয়ে খাবার নিচ্ছে, সেও নিল। সেই সময় সে লক্ষ্য করল একজন বেশ মাতব্বর গোছের লোক অনেকের সঙ্গেই কথা বলে তাদের থাকার জায়গা নির্দিষ্ট করে দিচ্ছে আর একজন পালোয়ানের মত চেহারার লোক খেতে দিচ্ছে। পালোয়ানের মত লোকটির কাছে গিয়ে কমল খাবার নিয়ে খেয়ে উঠে গিয়ে সেই মাতব্বর গোছের লোকটির কাছে গিয়ে দাঁড়ালো আশ্রয় প্রার্থী হয়ে, আশ্রয় মিলে গেল। দু' তিন দিন নির্ভাবনায় কেটেও গেল, তারপর একদিন রাত্রে খেয়ে দেয়ে সে ঘুমিয়ে পড়েছে, হঠাৎ একটা দম আটকানো অনুভূতি হতে তার ঘুম ভেঙে যেতে সে দেখল যে পালোয়ানের মত লোকটি তার বুকের ওপরে উঠে বসেছে তার গলাটা টিপে ধরে আর সেই মাতব্বর লোকটি তাকে পুলিশের চর মনে করে শাসাচ্ছে যে সে নাকি ওদের আশ্রমের খবর পুলিশকে দেবে বলে এখানে ঘাঁটি গেঁড়েছে, সে যেন পরেরদিন ভোর হবার সাথে সাথে বেনারস ছাড়ে, না হলে আর বেঁচে ফিরবে না সে। প্যান্টের ভিতরের পকেটে তার বারোটা টাকা ছিল, সেটাও ওরা বের করে নিয়েছে। এতো সত্যি সত্যি "শিবঠাকুরের আপন দেশে নিয়ম কানুন সব্বোনেশে হয়ে গেল ব্যাপার।"

BANGLADARSHAN.COM

কমল খুবই হতোদ্যম হয়ে সেই আশ্রম ছাড়ল, আবার সে উঠে বসল হরিদ্বারগামী একটি ট্রেনে আর পরেরদিন যখন হরিদ্বারের কাছে ট্রেন, তখন কমল ট্রেনে বসে দেখল দূরে আবছা হিমালয়ের পর্বতশ্রেণীর আভাস দেখতে পাচ্ছে সে। সে আশে পাশের লোকজনের কথা শুনে বুঝল ট্রেন হরিদ্বারে ঢুকছে। ট্রেন হরিদ্বারে থামল, সে ট্রেন থেকে নেমে পড়ল। প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে রইল ক্রমে অপসৃয়মান ট্রেনটার দিকে, তারপরে সে বাইরে এলো।

বাইরে এসে সে হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে উপস্থিত হল গঙ্গার ধারে। গঙ্গাতটে দাঁড়িয়ে আশে পাশের প্রাকৃতিক শোভায় তার মন ভরে গেল, মনসা পাহাড়ের মাথায় মনসা মন্দির, চণ্ডী পাহাড়ের চণ্ডী মন্দির, অদূরে হিমালয়ের শৈল শিখর আর মহাদেবের জটা থেকে নিঃসৃত পতিতোদ্ধারিনী গঙ্গার স্তবঃ প্রভাহিত শীতল পবিত্রধারা মিলে হরিদ্বার সত্যই দেবতাত্মার প্রবেশদ্বার। তারপরে হাঁটতে হাঁটতে "হর কি প্যারি"র ঘাটের সিঁড়িতে গিয়ে বসল। সারাটা দিন অভুক্ত অবস্থায় তার কেটে গেল ওই ঘাটে, সে খেয়াল করল উল্টোদিকের তটে গঙ্গার অপার পাড়ে রক্তাম্বর পরিহিত এক সন্ন্যাসী বসে আছেন সকাল থেকে, তাঁর চিমটে, ত্রিশূল আর ঝোলাটা পাশেই নামানো রয়েছে আর তিনি নিমীলিত নেত্রে ধ্যান মগ্ন। দুপুরের দিকে সে আস্তে আস্তে উঠে গঙ্গার অন্য তীরে গিয়ে দাঁড়াল পায়ে পায়ে, মন তার খুবই ভারাক্রান্ত হয়ে রয়েছে কাল রাত্রের ঘটনায়। তারপরে সে চলতে আরম্ভ করল উদ্দেশ্যহীন ভাবে। সেই রক্তাম্বর পরিহিত সন্ন্যাসীর পাশ দিয়ে একটু এগিয়ে যাবার পরে সে শুনল কেউ তার নাম ধরে ডাকছে। সে কিছুটা বিস্মিত হলেও এগোতে যাবে এমন সময় সে শুনল কেউ বলছে, "এ বাঙালি ভূত, তেরা নানা বহুত ভারি খোঁজ লাগায়া রে তেরে লিয়ে। কাল রাত কয়সা সাধুসঙ্গ হুয়া রে তেরা?" কমল খুবই অবাক হয়ে এদিক ওদিক খুঁজতে খুঁজতে দেখে সেই রক্তাম্বর পরিহিত সন্ন্যাসী উঠে দাঁড়িয়ে তার দিকে চেয়ে মৃদু মৃদু হাসছেন আর হাত নেড়ে তাকে কাছে ডাকছেন। সে কাছে যেতে তিনি আবার তাকে ওই একই কথাগুলো বললেন, বলে বললেন, "মুঝে আজহি তুরন্ত ইঁহা আনা পড়া তেরে লিয়ে, তু চল মেরে সাথ।" এই বলে এগিয়ে এসে ছোট্ট কমলের হাতটা ধরলেন, কমল অবাক হয়ে দেখল সন্ন্যাসী প্রায় সাত ফুট লম্বা, কৃষ্ণবর্ণ, শ্বশ্রুগুম্ফ সম্বলিত প্রশান্ত মুখমন্ডল। কমলের মনে তখন তোলপাড় চলছে তার দাদামশাই তার খোঁক করছেন এবং তার মা চিন্তিত হয়েছেন সেই সংবাদটি জেনে, আর এই সন্ন্যাসী তার নাম, তার সঙ্গে ঘটে যাওয়া গতকাল রাত্রের ঘটনা কিভাবে জানলেন এইসব চিন্তায় সে স্তম্ভিত। সে তো কাউকে কিছুই বলেনি এই বিষয়ে। সন্ন্যাসী তার করতলটি নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে হাঁটতে আরম্ভ করেছেন গঙ্গার তটরেখা ধরে ততক্ষনে। হাঁটতে হাঁটতে দিনের আলোর শেষ রেশটুকু যখন মুছে যাচ্ছে সন্ন্যাসী ঋষিকেশের কাছে এক জায়গায় থামলেন, থেমে তাঁর ঝোলা থেকে তাঁকে গরম পুরি তরকারি খেতে দিলেন। সে ক্ষুধার্ত আর ক্লান্ত ছিল, তায় পরপর তার সঙ্গে ঘটে যাওয়া ঘটনার অভিঘাতে বিমূঢ় ছিল, খেয়ে নেবার পরে সে গঙ্গার ঘাটেই ঘুমিয়ে পড়ল সন্ন্যাসীর আসনের পাশে। পরেরদিন ঘুম ভাঙার পরে আবার চলতে শুরু করল তারা, তৃতীয় দিনে তারা গিয়ে পৌঁছল বদ্রীনারায়ণের নিকটবর্তী ব্যাসপীঠে, যেখানে এই সন্ন্যাসীর ডেরা। সন্ন্যাসীর ডেরাতে পৌঁছে কমল দেখল আরো কয়েকজন রয়েছে সেখানে আর জানতে পারল

BANGLADARSHAN.COM

সন্ন্যাসী হলেন জীবন্মুক্ত নিত্যসিদ্ধ হঠযোগে ও লয়যোগে সিদ্ধযোগী ব্রহ্মানন্দ পরমহংস, যাঁকে সবাই যোগীবাবা বলে সম্বোধন করে।

ব্যাসপীঠে আসার কিছুদিনের মধ্যে যোগীবাবা কমলকে দীক্ষা দিলেন এবং সাধনার বিভিন্ন পদ্ধতি রপ্ত করাতে শুরু করলেন। আশ্রমের রোজের কাজকর্মের দায়িত্ব যেমন রান্না, দূরের পাহাড়ে গিয়ে কাঠ সংগ্রহ করা, জল আনা ইত্যাদি কাজ অন্যসব গুরুভাইদের সঙ্গে সঙ্গে কমলের ওপরেও ন্যস্ত ছিল। কমল খুব দ্রুত তার সাধনার স্তর গুলি অতিক্রম করতে লাগল। হিমালয়ের ব্যাসপীঠের ধ্যানগম্ভীর পরিবেশ, নীলকণ্ঠ পর্বতের তুষারধবল শৃঙ্গ, পারিপার্শ্বিকের অটল নৈঃশব্দ আর সর্বোপরি সদ্গুরু যোগীবাবার নিয়ত সান্নিধ্য ও পথপ্রদর্শন কমলকে অচিরেই এক মহাজীবন আস্বাদনের যাত্রী করে তুলল। দেখতে দেখতে চোদ্দ বছর অতিক্রান্ত হল তার ব্যাসপীঠে, এই চোদ্দ বছরে কমল অনুভব করল যে যোগীবাবা যেন তার একাধারে মাতা, পিতা, সখা, গুরু এবং তার ইহকাল পরকালের একমাত্র অবলম্বন হয়ে উঠেছেন। টানা চোদ্দ বছর সাধনা করে কমল সিদ্ধিলাভ করল, এখন তার নাম হল শ্রীকেবলানন্দ পরমহংস। যোগীবাবা তার সাধনা কালীন সময়ে বিভিন্ন রকম ভাবে পরীক্ষা নিয়ে দেখে নিয়েছিলেন তার আধারটি সাধনার জন্য কতখানি উপযুক্ত এবং সে কতটা গুরুগতপ্রাণ।

এবার যোগীবাবা কমলকে পাঠালেন পরিব্রাজনায়, তার আগে অবশ্য কমলকে যোগীবাবা পাঠিয়েছিলেন তার মায়ের সঙ্গে দেখা করতে। মা ভীষণ অসুস্থ ছিলেন তখন, ছেলেকে ফিরে পেয়ে তিনি অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠলেন। যে অঙ্ক পরীক্ষা খারাপ হয়েছে মনে করে কমল গৃহত্যাগ করেছিল, দেখা গেল সেই অঙ্কতে কমল লেটার নিয়ে ফার্স্ট ডিভিশনে ম্যাট্রিক পাশ করেছে। কিন্তু আশুতোষ কলেজে ভর্তি হয়ে কিছুদিন ক্লাস করার পরে কমল যোগীবাবার নির্দেশে বেরিয়ে পড়ে পরিব্রাজনে এবং সমগ্র ভারতবর্ষ সে এইভাবে তিনবার ভ্রমণ করে। কয়েকবছর পরে কমলের ক্রিয়াযোগে দীক্ষা হয়, সে আত্মদর্শন করে নিজের সচ্চিদানন্দময় আত্মার দর্শন লাভ করে, নিজের স্বরূপ জেনে আরো কিছুবছর সাধন করে সিদ্ধি লাভ করে আপ্তকাম হয়। এরপরে সে তান্ত্রিক দীক্ষা নিয়ে তন্ত্র সাধনা করে কালের নিয়ন্ত্রণকারী মা কালীর দর্শন ও বরদানে ধন্য হয়। এইভাবে এক সাধারণ ঘরের সাধারণ ছেলে কমলের জীবন থেকে মহাজীবনের পথে ঘটে উত্তরন। সে আমৃত্যু লোকহিতের ব্রত নিয়ে লোককল্যাণের নিমিত্ত নিজের জীবন উৎসর্গ করে। সাধারণ গৃহস্থ ঘরের ছেলে কমল হয়ে ওঠে মহাত্মা কেবলানন্দ পরমহংস যে হয়ে ওঠে বহু অনাথ, জিজ্ঞাসু ও মুমুক্ষুর আশ্রয়স্থল।

BANGLADARSHAN.COM

তথ্যসূত্র: শ্রীশ্রীমা সর্বাণী প্রজ্ঞান সরোজ

॥বুদ্ধির বাইরে॥

আমার বড়দিদার কথা আগে কিছু কিছু লিখেছি বটে, তাঁর দুর্দান্ত সাহস, উপস্থিত বুদ্ধি, দাপট কিন্তু একটা বড়ো অংশ নিয়ে না লিখলে অনেকটাই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে তাঁর কথা। সেই অংশটা হল বড়দিদার কালীপুজো আর কেন এই কালীপুজো উনি শুরু করেছিলেন।

বড়ো দিদার ছেলে মেয়ে হয়েছিল অনেকগুলো, বারোজন, কিন্তু জীবিত ছিল মাত্র পাঁচ জন, চার মেয়ে আর এক ছেলে। বাকি সাতজনের ক্ষেত্রে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটতো, সুস্থ সুন্দর সন্তানের জন্ম হল, তখন তারা জন্মাতো বাড়িতে দাইয়ের হাতে, ঠিক ষষ্টি পুজোর দিন মাঝরাত্রে বড়দিদার কাছে আসতো একটা কালো ছোটো মেয়ে, চুল তার খোলা, এসে বড়দিদার কাছে বাচ্ছা চাইত হাত বাড়িয়ে, বলত, “ছেলে দে, ছেলে দে”, ঠিক ওই সময়েই বড়োদিদার অসম্ভব ঘুম আসতো, তবু জোর করে জেগে থাকতে চেষ্টা করত বড়দিদা, কিন্তু একটু পরে ঘুমিয়ে পড়ত। যখন ঘুম ভাঙত, কোলের বাচ্ছার দেহ ঠান্ডা, প্রাণহীন।

বারবার সাতবার এমন হতে বড়দিদার পাগলের মত অবস্থা হয়, উনি দৌড়োন নানান জায়গায় এর প্রতিকারের আশায়। কোনো এক তান্ত্রিক ওঁকে বলেন বাড়িতে কালীপুজো করতে, সেই তান্ত্রিকের কথায় বড়দিদা শুরু করেন কালীপুজো। দীপাবলির কালীপুজোর দিন ষোড়শোপচারে ভোগ দিয়ে মাঝরাত্রে করতেন সেই পুজো। শুধু যে জোগাড় করবে পুজোর সে আর বড়দিদা স্বয়ং ছাড়া আর কেউ থাকতে পারবে না ওই পুজোর জায়গায়। পুজো শেষ হলেও ভোরের আগে নিচে নামতেন না উনি। পুজো শুরু হবার পরে ওঁর এই পাঁচ ছেলে মেয়ের জন্ম আর বেড়ে ওঠা। কিন্তু তখন ওই বাড়িতে অন্য সমস্যা শুরু হল। বাড়ির আনাচে কানাচে কিছু ছায়ামূর্তির আবির্ভাব হতে লাগল। দিনের বেলায় ওঁদের বাড়িতে ঢুকলেও কেমন গা টা ভারী লাগত, গা ছমছম করত।

BANGLADARSHAN.COM

আমার মামা মানে বড়দিদার বোনপো আবার দেওরপো দেখেছিল সেই অশরীরী বেশ কয়েকবার। বড়দিদার বাড়ি আর আমার দিদার বাড়ি মাঝখানে ছিল একটা পাঁচিল যার শেষে একটা দরজার ছিল দু বাড়ির ভেতর দিয়ে, যাতে ভেতর দিয়ে যাতায়াত করা যায়। ওই দরজার পাশে ছিল বড়দিদার বাড়ির দিকে একটা কামিনী ফুলের গাছ আর আমার দিদার বাড়ির দিকে স্থলপদ্ম গাছ আর মাধবীলতার ঝাড়। ওই জায়গাটা বেশ অন্ধকার থাকত সন্ধের পরে, ওখানে মামা দেখেছিল লালপাড় সাদা শাড়ি পরে কেউ দাঁড়িয়ে আছে, মামা, “কে ওখানে?” জিজ্ঞেস করতে সে ঘুরে দাঁড়িয়ে যে হাত আর মুখটা দেখিয়েছিলো, সেই মুখটা কোনো মানুষের মুখ নয়, করোটি আর হাতটায় কোনো মাংস নেই, হাড়। মামা এতো ভয় পেয়েছিল সে পনেরোদিন জ্বরে ভুগেছিল তারপরে। আমাদের বারণ ছিল ওই ভেতরের দরজা দিয়ে যাতায়াত, পরে ওই দরজাটা সীল করে বন্ধ করে দেন মামা। বড়দিদার ছেলে সেজমামা ওদের তিনতলায় ন্যাড়া ছাদে দেখেছিল বেশ কয়েকবার ছাদের কোণ

ঘেঁষে লাল পেড়ে শাড়ি পরা কেউ দাঁড়িয়ে, কে বলে এগিয়ে যেতে গেলে দপ করে একটা আগুনের বলয় হয়ে মুহূর্তে মিলিয়ে যেত, এই ঘটনা বেশ কয়েকবার ঘটেছে।

এইরকম অবস্থায় একমাত্র ছেলে সেজমামা সবে কলেজে ঢুকতেই বড়দিদা বিয়ে দিয়ে দিলেন। বড়দিদা এই ছেলে বংশের সেজ বলে আমরা বলতাম সেজমামা। সেই সেজমামা অষ্টমঙ্গলার পরেরদিন বড়োদাদুর পায়ের একটা ফুসকুড়ি থেকে গ্যাংগ্রিন তৈরী হয়েছে ধরা পড়ল আর ঠিক তার একমাসের মধ্যে দাদু মারা গেলেন। দাদুর কাজ করার সময়ে সেজমামা যে ভদ্রলোককে নিয়ে এলেন শ্রাদ্ধের কাজ করাতে, তাঁর কিছু ক্ষমতা ছিল, তিনি ঢুকেই বললেন, “বাড়িতে দোষ আছে।” সেজমামা বললেন, “কাজ মিটে গেলে শান্তি স্বস্তায়ণ করে নারায়ণ পুজো করতে হবে তাহলে।” সেই পুরোহিত ভদ্রলোক বললেন, “এই দোষ শান্তি স্বস্তায়ণে যাবে না, বাড়িতে বাস্তু দোষ ঘটে গেছে। দোষের কারণ কালীপুজোয় কিছু ত্রুটি হয়েছে যেটা অজ্ঞাতে হলেও মা রুষ্টা হয়েছেন। তারই প্রকোপে এই বাড়িতে অশরীরী উপস্থিতি ও গা ছমছমে অনুভূতি।” এদিকে বড়দিদা কালীপুজো কিছুতেই বন্ধ করতে দেবেন না। শেষে আমার দাদু, যিনি সম্পর্কে বড়দিদার দেওর আবার ভগ্নিপতি তিনি একপ্রকার ধমকে ওই পুজো বন্ধ করান। চন্ডীপাঠ সহ যজ্ঞ করতে হয় বাড়িতে, তারপরে সেই প্রকোপ কমে। আমার দাদুর নাম ছিল এলাকায় শুদ্ধ সুন্দর চন্ডীপাঠ করেন বলে, দাদু তাই সেই চন্ডীপাঠ করেছিলেন সারাদিন ধরে। শেষে বড়দিদা মারা যাবার পরে বড়দিদার শ্রাদ্ধের পরে বাড়িতে শান্তি স্বস্তায়ণ করে নারায়ণ পুজো হয়। তারপরে সেজমামা মারা যেতে বাড়ি প্রমোটরকে দিয়ে ফ্ল্যাট তৈরী হলে এই দোষ কাটে। শেষের দিকে বড়দিদা নিজেই বলতেন, “বাবা, মা কালী হচ্ছে কাঁচা খেগো দেবতা, কেউ বাড়িতে কালীপুজো করিস না।” আজও বুদ্ধি দিয়ে ব্যাখ্যা করে উঠতে পারিনি ঠিক কি ছিল ওবাড়িতে আর কেনই বা এমন সব ঘটনা ঘটতো ওঁদের বাড়িতে।

BANGLADARSHAN.COM

॥রাধানগরের চাটুজ্জেবাড়ি॥

বাঁকুড়া বিষ্ণুপুরের মল্লভূমরাজ শ্রীরামকৃষ্ণ সিংহদেবের দেওয়ান ছিলেন শ্রীরামশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়। তাঁর জমিদারির অন্তর্গত ছিল রাধানগর, অযোধ্যা, কাঁকলা আর ভোরা। স্বর্গীয় শ্রীরামশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়ের ভদ্রাসনটি ছিল রাধানগরে বর্তমান সোনামুখী রাধানগর বাস রাস্তা সংলগ্ন স্থানে, বর্তমান বাস রাস্তাটি চাটুজ্জে বাড়ির জমির ওপর দিয়েই তৈরী হয়েছে। বিষ্ণুপুর থেকে রাধানগরের দূরত্ব ছ মাইল। ভদ্রাসনটির পাশেই কুলদেবতা রঘুবীরের মন্দির আর ভদ্রাসনের একপাশে রয়েছে পুরাতন দুর্গাদালান, যেখানে প্রতিবছর মা দুর্গার পূজাটি গ্রামের লোকেদের সার্বজনীন আনন্দোৎসব। ভদ্রাসনের ভেতরে বিরাট উঠোন যেখানে সার দিয়ে ধানের মড়াই বাঁধা থাকত, ঠাকুরদালানের একপাশে মায়ের পূজার হাড়িকাঠ, ঠিক উঠোনের মাঝখানে একটি বিরাট আমগাছ আর বাড়ির ঠিক পেছনে চাটুজ্জেদের নিজেদের পুকুর চাটুজ্জেগোড়া। গ্রামের মধ্যেকার মোট বাহান্নটি পুকুরে চাটুজ্জে বংশের ভাগ ছিল, তাই বাড়িতে কোনো অনুষ্ঠান হলে এই পুকুরের মাছ দিয়েই তা উদ্ধার হয়ে যেত। চাটুজ্জেবাড়ি ছাড়িয়ে একটু এগিয়ে ডান দিকের রাস্তায় এগোলেই পড়ে গঙ্গাধরের মন্দির, গাজনের মাঠ আর চন্ডীমণ্ডপ যেগুলি সবই চাটুজ্জেদের যে কোনো বিবাহে সিঁদুরদান হয়। শ্রীরামশঙ্কর চাটুজ্জের পুত্র ছিলেন শ্রীরাঘবেন্দ্র চাটুজ্জে, যাঁর পুত্র শ্রীবামাচরণ চাটুজ্জের দুটি পুত্র, শ্রীসত্যশরণ ও শ্রীসত্যকিঙ্কর। শ্রীবামাচরণের সময় পর্যন্ত বাড়ির গোয়ালেতে চল্লিশ বেয়াল্লিশটা গরু থাকত, কিন্তু বামাচরণের স্ত্রীবিয়োগের পরে ছেলেরা কর্মসূত্রে বাইরে চলে যায়, তাই গোয়ালের বেশিরভাগ গরুই দান করে দেন বামাচরণ।

BANGLADARSHAN.COM

বামাচরণের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীসত্যশরণের বিবাহ হয় বর্ধমানের ছোটবৈনানের জমিদার শ্রীঅঘোরমোহন মুখোপাধ্যায়ের একমাত্র কন্যা শ্রীমতী সরলাবালা দেবীর সঙ্গে এবং যেহেতু অঘোরমোহনের কোনো ছেলে ছিল না তাঁর বিশাল জমিদারি দেখাশোনার জন্য, তাই শ্রীসত্যশরণ স্ত্রীর সঙ্গে গিয়ে ছোট বৈনানে বসবাস করে জমিদারির তদারকি করতে থাকেন, এছাড়াও তিনি রেলে চাকরি করতেন, যেটি ছিল বদলির চাকরি। ছেলেমেয়েদের ঠিকভাবে মানুষ করা ও লেখাপড়া চালানোর জন্য উনি পরিবারকে ছোট বৈনানে রেখে কর্মস্থলে থাকতেন এবং একপক্ষকাল বা মাসে একবার বাড়িতে আসতেন। শ্রীবামাচরণের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীসত্যকিঙ্কর চ্যাটার্জীর বিয়ে হয় রাধানগরের পাশের গ্রাম অযোধ্যার মায়ের পূজারী শ্রীদামোদর গঙ্গোপাধ্যায়ের একমাত্র কন্যা শ্রীমতী সুভদ্রাদেবীর সঙ্গে। শ্রীসত্যকিঙ্কর চাটুজ্জে ছিলেন দানাপুর স্টেশনের স্টেশন মাস্টার। শ্রীসত্যকিঙ্কর চাটুজ্জে পরে বিষ্ণুপুরে পুরোনো মিউনিসিপালিটির পাশে গোঁসাইনদের কয়লার ডিপোর পিছনে নিজগৃহ নির্মাণ করেন। শ্রীসত্যকিঙ্করের তিনটি পুত্র আর তিনটি কন্যা, জ্যেষ্ঠ পুত্র স্বর্গীয় শ্রীঅর্ধেন্দুভূষণ চ্যাটার্জী আমার পিতা। আমার পিতা দূর্গাপুরে কর্মরত ছিলেন। বাকি দুই কাকা থাকতেন বিষ্ণুপুরের দাদুর করা বাড়িতে, পরে ছোটকাকা বিষ্ণুপুরেই অন্যত্র বাড়ি করেন।

রাধানগর গ্রামের সঙ্গে আমার সংযোগ খুবই ক্ষীণ, কিন্তু আমার পিতৃবংশের দুটি অদ্ভুত ঘটনা বলার জন্য এই লেখার অবতারণা। প্রথমটি হচ্ছে ওই সতীমায়ের থান। সতীমা ছিলেন বাবার ঠার্কুদা শ্রীরাঘবেন্দ্র চাটুজ্জের

সতী সাধ্বী পতিব্রতা স্ত্রী, স্বামীর মঙ্গলকামনায় নিবেদিত প্রাণ, পতিপ্রাণা ভক্তিমতী সহধর্মিণী। রঘুবীরের নিত্যপূজা নিজের হাতে না করে তিনি জলস্পর্শ করেননি কখনো। শ্রীরাঘবেন্দ্র চাটুজ্জে শেষ জীবনে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে বহুদিন শয্যাগত ছিলেন। সতীমা দিবারাত্র একককরে তাঁর সেবা করে যাচ্ছিলেন কিন্তু বৈধব্য জীবন তাঁর কাছে দুঃস্বপ্নবৎ ছিল এবং তাই তিনি নিত্য রঘুবীরের কাছে আর্জি জানাতেন স্বামীর আগে নিজের মৃত্যুর জন্যে। এরপরে শ্রীরাঘবেন্দ্র চাটুজ্জের যখন শ্বাস উঠে গেছে দেখলেন সতীমা, তিনি এক অদ্ভুত প্রতিজ্ঞা করেন। তিনি রঘুবীরশিলার সামনে দাঁড়িয়ে প্রতিজ্ঞা করেন যে তিনি যদি কায়মনোবাক্যে সত্যিই সতী হন তো স্বামীর অন্তিম শ্বাসের আগে তিনি দেহ ছাড়বেন এবং তাঁর জাঙের মাঝখান থেকে তাঁর বংশধরেরা সিঁদুর কৌটো পাবে যে সিঁদুর দিয়ে তাঁর অন্তিম যাত্রায় সিঁথি রঞ্জিত হবে এবং যেটা চাটুজ্জে বংশকে চিরকাল গৌরবান্বিত করবে। শোনা যায়, তাঁর এই ভীষণ প্রতিজ্ঞা শেষ হওয়া মাত্র তাঁর শ্বাস ওঠে এবং তিনি দেহ রাখেন, শ্রীরাঘবেন্দ্র চাটুজ্জে তাঁর পরে মারা যান। তিনি সধবা অবস্থায় দেহ রাখলে তাঁর পুত্র ও বংশের লোকজন সত্যি সত্যি তাঁর জাঙের ভেতর থেকে সিঁদুর কৌটো উদ্ধার করেন, তাঁকে সেই সিঁদুরটাই পরানো হয় তাঁর অন্তিমযাত্রায় আর তিনি যে জায়গায় দেহত্যাগ করেন সেই জায়গাটি বাঁধিয়ে সেখানে এই সিঁদুর কৌটোটি পূজিত হতে থাকে তাঁর সতীত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ, আমার স্বর্গতা জননীকে তাঁর বিয়ের সময় ঐখানকার সিঁদুর দান করা হয়েছিল বলে তাঁর কাছে শুনেছিলাম।

BANGLADARSHAN.COM

দুর্গাদালানের প্রসঙ্গে মায়ের কাছে শুনেছি যে চাটুজ্জেদের দূর্গাপূজা মহাধূমধাম করে হয়, অষ্টমীর সন্ধিপুজোয় মাকে একশো আটটা পদ্মফুলের মালায় সাজানো হয়, ঘটেও প্রচুর অন্য ফুলের সঙ্গে পদ্মফুল থাকে। ঠিক সন্ধিপুজোর সময় যখন দেবী চামুণ্ডার আরাধনা করে মৃন্ময়ী প্রতিমাতে প্রাণ সঞ্চার হয় দেবী চিঞ্চয়ী হয়ে ওঠেন, তখন দেবীর ঘটের পদ্মটি দেবীর আশীর্বাদ স্বরূপ ঘট থেকে নিচে পড়ে। যদি দূর্গা দালানে চাটুজ্জে বংশের লোকজন ছাড়া অন্য কেউ উপস্থিত থাকে তাহলে সেই ফুলটি আর পড়েনা।

আমি আমার একুশ বছর বয়স পর্যন্ত রাধানগরে গেছি, মূলতঃ ধানাদায়ের সময় শীতকালে, মাটির দোতলা মাঠকোঠাতে থেকেছি, তখনো সেখানে বিদ্যুৎ ছিল না, হ্যারিকেনের আলোয় কাঁথা মুড়ি দিয়ে কাকা পিসিদের সাথে থেকেছি, জলখাবারে চপ মুড়ি বোঁদে খেয়েছি, চাটুজ্জেগোড়ায় চান করেছি, ধানের মড়াইয়ে ধান রাখা দেখেছি, আখের রস জ্বাল দিয়ে আখের গুড় তৈরী, খেঁজুর রস জ্বাল দিয়ে খেঁজুর গুড় তৈরী হচ্ছে, আখ মাড়াইয়ের ঘানির চারপাশে বলদ ঘুরছে এইসব দেখেছি, গরম আখের গুড়, খেঁজুর গুড় শালপাতার দোনায় করে খেয়েছি আর দাদু শ্রীসত্যকিঙ্কর চ্যাটার্জী বেঁচে থাকতে মনে পড়ে জমির আলে দাঁড়িয়ে দাদু আঙ্গুল দিয়ে দেখাচ্ছেন যতদূর চোখ যায় যে সবুজ খেত, সব আমাদের জমি, জমি বর্গা হবার পরেও বাবা বলতেন পঞ্চাশ বিঘে জমি আমাদের, বাবা ১৯৮৬ সালেও একার ভাগের ধান বেচেছেন দশ হাজার টাকার আর সেই টাকা পুরোটাই ঠাকুমার হাতে তুলে দিয়েছেন যযার থেকে একশো টাকা ঠাকুমা বাবাকে দিতেন আমাদের জন্য মিষ্টি নিয়ে আসতে, সেই সম্পত্তির ভাগ আমরা নিতে যাইনি বাবার অবর্তমানে, না আমি গেছি, না আমার বোন গেছে। আর মনে পড়ে একবার চলন্ত খড়বোঝাই গরুর গাড়ির সামনে পড়ে গেছিলাম, গাড়োয়ান সাবধান

করতে গিয়ে তাঁর হাতের ঘণ্টা বাজিয়ে বলেছিলেন, “অ পুঁটি, সৈরে যা লো”, সেটাও ধানাদায়ের জন্য শীতকালেই যাওয়া হয়েছিল, দাদু তাড়াতাড়ি করে এসে কোলে নিয়ে রাস্তার একপাশে সরে দাঁড়িয়ে ছিলেন আর আমি ভীষণ রেগে সেই গাড়োয়ানকে বলেছিলাম, “আমি পুঁটি নই, আমার নাম পম্পা”, শুনে দাদু খুব হেসেছিলেন আর অনেকদিন পর্যন্ত আমায় “পুঁটি” বলে ডেকে রাগাতেন। আসলে ওই অঞ্চলে ছোট মেয়ে মাত্রই “পুঁটি” বলার রেওয়াজ আছে।

BANGLADARSHAN.COM

॥টান বহমান॥

সুখনরাম আর পার্বতীয়া মধ্যপ্রদেশের নরসিংপুর জেলার কেরাপানি গ্রামের সম্পন্ন চাষী দম্পতি। সারাদিন ক্ষেতের কাজে সময় কাটে সুখনরামের আর পার্বতীয়ার ব্যস্ততা থাকে রান্নাবান্না, চুলাচাক্কি, গায় ভেইষদের দেখরেখ, তদারিক আর পূজাপাঠে। তারা দুজনেই খুব ভক্তিমান স্বামী স্ত্রী। বড়োই দুঃখী তারা, পর পর তিনবার তিনটে সন্তান হল, কিন্তু প্রথমজন দু মাস, দ্বিতীয় জন এক বছর আর তৃতীয় জন তিন বছর বাঁচল তারপরে চলে গেল পার্বতীয়ার কোল খালি করে।

আবার পার্বতীয়া অন্তঃসত্তা, আবার খুশির খবর তাদের ঘরে। সুখনরামের ভাইবেরাদর সবাই পাশেই থাকে, তারা পার্বতীয়াকে কড়া নজরদারিতে রেখেছে, সুখনরামও চেষ্টা করছে বৌয়ের যত্ন করার। দেখতে দেখতে পার্বতীয়ার প্রসব বেদনা উঠল এবং ছেলে হল, সুন্দর 'চান্দা যায়শা' বেটা হল, সুখনরাম আর পার্বতীয়া আদর করে বেটার নাম রাখল সুরজদেও। আত্মীয় পরিজনের মাঝে, মা বাবার লাড প্যারে বাড়তে লাগল সুরজ। পাঁচ বছরে তাকে আংরেজি স্কুলে দাখলা করে দিল, একটু একটু করে ক্ষেতের কাজও শেখাতে লাগল অবসর মত। বড়োই আদরের লাডলা সুরজ, খেতি দেখার জন্য মুনিষ আছে, কিন্তু তাদের খাটাতে গেলেও ওকে ক্ষেতের কাজটা জানতে হবে, তাই শেখানো।

BANGLADARSHAN.COM

এদিকে আংরেজি স্কুলে ভালোই পড়ছে বেটা, দেখতে দেখতে সাত কেলাস হয়ে গেল। আটোয়া কেলাসে পড়ার সময় বায়না করল একটা বাইকের। অনেক টাল বাহানা করে কিনে দিল সুখনরাম। সুরজকে আর পায় কে!!! একদম হাওয়ায় উড়তে লাগল সে। এদিকে শীতের সময় খুব ঠান্ডা পড়ে এদিকে, এবারেও পড়েছে, ছ সাত ডিগ্রি যাচ্ছে তাপমাত্র, এমনই এক এতবারের (রবিবার) দিনে সারাদিন বন্ধুদের সাথে বাইরে কাটিয়ে এলো সুরজ বাইক নিয়ে, পিকনিকে গেছিল সে, ফিরল রাত্রে। এসেই শুয়ে পড়ল। পরেরদিন থেকে ধুম জ্বর এলো, বহু ডাক্তার দেখানো হলো, বহু মানত করল পার্বতীয়া আর সুখনরাম। কিন্তু মা বাপের সব আশা নিরাশায় বদলে সুরজ "ভগবান কা প্যারা" হয়ে গেল মায়ের কোল খালি করে। সুখনরাম আর পার্বতীয়া একদম শোকে বিহ্বল হয়ে ভেঙে পড়ল। তাদের নাওয়া খাওয়া রোজের খেতি বাড়ি সবের মধ্যে থেকে মন উঠে গেল। জীবন যেন একটা বোঝা তাদের কাছে, বাঁচতে ইচ্ছে করে না, খেতে ইচ্ছে করে না, উঠে বাইরে যেতে ইচ্ছে করেনা, সব ভীষণ অর্থহীন লাগে তাদের কাছে। এইভাবে চলল কিছুদিন।

তারপরে সুখনরাম ঠিক করল নর্মদা পরিক্রমা করবে, তখন তার বয়স বাহান্ন। পার্বতীয়া প্রথমে রাজি হয় নি, কিন্তু সুখনরাম না থাকলে তারই বা কাকে নিয়ে সংসার? তাই সেও সঙ্গে চলল, সেও তখন চুয়াল্লিশ। চলল দুজনে নর্মদা পরিক্রমায়, দক্ষিণ তটের সামনাপুর ঘাট থেকে তাঁদের পরিক্রমা শুরু হল, সেখান থেকে সঙ্গম অতিক্রম করে উত্তরতট ধরে অমরকণ্টক পৌঁছল আর সেখানে চোদ্দ দিন অবস্থান করল। প্রথমবার পুরো পরিক্রমা করে ঘরে ফিরল। সমাপ্তি পূজন করল ওঁমকারেশ্বরে, সাধু ভান্ডারা দিল বড়ো করে ব্রহ্মকুন্ডে। কিন্তু

ফিরে তাদের ঘরে মন টিকল না, আবার চলল তারা পরিক্রমায়, এবারে থেমে থেমে প্রায় সব জায়গায় দু চারদিন থেকে থেকে তিন বছর ধরে পরিক্রমা করে যখন আর পনেরো কিলোমিটার বাকী তাদের পরিক্রমা শেষ হতে এমন সময় সুখনরাম আর পার্বতীয়া পর পর দুদিন দুজনে স্বপ্ন দেখল মা নর্মদা যেন তাদেরকে বলছেন এখানেই পরিক্রমা শেষ করে থেকে যেতে এবং সদাব্রত আর পরিক্রমাকারীদের সেবা নিজেদের জীবনের ধর্ম মনে করে পালন করে যেতে আজীবন। তখন ব্রহ্মকুন্ড জঙ্গলাকীর্ণ ছিল, একমাত্র ব্রহ্মকুন্ডের পূজারী মহারাজের পরিবার এখানে বাস করত। তারা সব খেতি বাড়ি ভাইয়েদের, জ্ঞাতিদের হাতে ছেড়ে দিয়ে এই ব্রহ্মকুন্ড ঘাটে কুটিয়া বানিয়ে নর্মদা মায়ের পরিক্রমাকারীদের সেবাকেই জীবনের ব্রত করে জীবন অতিবাহিত করতে লাগলেন পরম আদর ও আন্তরিকতার সঙ্গে।

দেখতে দেখতে কেটে গেছে আরো পঁয়ত্রিশ বছর, এখন সুখনরাম আটানব্বই আর পার্বতীয়া নব্বই, পার্বতীয়া বয়সের ভারে বেশি নড়াচড়া করতে পারে না, অশক্ত শরীর তার, তাকে সকালে ঘুম থেকে তুলে রোদে বসানো, পরিক্রমাকারীদের সেবা করে, সদাব্রত দেওয়া, ঘরের রান্না, কাজ সব একা হাতে সামলাচ্ছে সুখনরাম, এখনো সে ভীষণ কর্মঠ। এমনি সময় একদিন পরিক্রমাকারী হিসেবে হাজির হয় সুশান্ত। সুশান্তকে সদাব্রতর জিনিস দিয়ে সুখনরাম গেল দুধ আনতে, ফেরার সময় নিজে নর্মদায় ডুব দিয়ে এসে যখন ঢুকল কুটিয়ায় দেখল সুশান্তর খিচুড়ি তৈরী। তাকে ফিরতে দেখে সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সুখনরামকে বলল খিচুড়ি প্রসাদ পেতে, সুখন হাতের জিনিসটা নামিয়ে রেখে তাড়াতাড়ি এসে খানিকটা প্রসাদ নিয়ে পার্বতীয়াকে দিল, তারপর সুশান্তর সঙ্গে নিজে বসল প্রসাদ পেতে। বহুদিন পরে সুখনরামের মনে হল সে যেন তার সুরজকে নিয়ে খেতে বসেছে। তার দু চোখ দিয়ে জল পড়লেও সেদিন খাবারটা যেন বড়োই সুস্বাদু মনে হল। সে বড়ো তৃপ্তি করে সেদিন ভোজন করল। তিনদিন থাকল সুশান্ত, তিনদিনই তার সাথে প্রসাদ পেল সুখনরাম আর পার্বতীয়া। তাকে দেখে বুড়োবুড়ি দুজনেরই যেন আবার সুরজকে মনে পড়ে যাচ্ছে। কিন্তু সে তো পরিক্রমাকারী, নর্মদা মায়ের সন্তান, পরিক্রমাই তার তপস্যা, এর টানেই সে পথে নেমেছে। চতুর্থ দিন যখন সুশান্ত তার ঝোলা ডান্ডা নিয়ে বেরোতে যাবে তখন দেখল দুই বুড়োবুড়ি অঝোরে কাঁদছে। কি ব্যাপার? তারা তার হাত দুটো ধরে আদায় করে নিল একটাই প্রতিশ্রুতি, সুশান্তর পরিক্রমা শেষ হলে সে যেন এখানেই তার ডেরা করে, দুই বুড়োবুড়ি তাহলেই ভীষণ শান্তিতে অন্তিম শ্বাস নিতে পারবে। তারা সেবা করছে এতো বছর ধরে পরিক্রমাকারীদের কিন্তু আর কারো সঙ্গে এতো 'লাগাও' হয়নি। সুশান্ত কথা দিল ফিরে এখানেই ডেরা করবে আর মনে মনে মা নর্মদাকে প্রণাম জানিয়ে এগিয়ে চলল তার পরিক্রমার পথে। জীবনের উপান্তে এসে সুখনরাম আর পার্বতীয়া উপলব্ধি করল তাদের অপত্য টান অন্তরে আজও বহমান।

BANGLADARSHAN.COM

ব্রহ্মকুন্ডের ২০০ বছরের
প্রাচীন মন্দির

ব্রহ্মকুন্ড আর তার ঘাটের সিঁড়ি

সুখনরাম ও পার্বতীয়া

BANGLADARSHAN.COM

॥সন্ন্যাসদীক্ষা॥

বহুদিন ধরে ভারত সেবাশ্রমের তাপস মহারাজের কাছে যাতায়াত বিমলেশের, ডাক্তার বিমলেশ ব্যানার্জী একজন সরকারি হাসপাতালের আধিকারিক। কিন্তু তিনি অন্তরে সংসারবিমুখ, তাঁর তীব্র বৈরাগ্য মনে। এতদিন মা, বাবার জন্যে সংসারে ছিলেন। তাঁরা বহু কষ্ট করে তাঁকে বড়ো করেছেন। বাবা সামান্য চাকরি করতেন, তিনি আর মা মিলে তাঁর লেখাপড়ার ব্যাপারে ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ। তিনি ভালো ছাত্র ছিলেন, তাই তিনি ভালো স্কুলে পড়ে ভালো রেজাল্ট করে ডাক্তারিতে চান্স পান এবং গোল্ড মেডেল নিয়ে ডাক্তারি পাশ করেন। স্কলারশিপ নিয়ে বিদেশে গিয়ে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ফেরেন রেটিনা স্পেশালিস্ট হয়ে, তারপরে তিনি যোগ দেন এই সরকারি হাসপাতালে যেখানে তাঁকে যে প্রফেসররা পড়িয়েছেন তাঁরাও আছেন এখন তাঁর সহকর্মী হিসেবে। তাঁর সেই শিক্ষক প্রফেসররা খুব গর্বিত তাঁকে তাঁদের মধ্যে পেয়ে। কলকাতার যে কয়েকজন নামী অপথালমলোজিস্ট আছেন এখন, তিনি তাদের মধ্যে অগ্রগণ্য। চোখের মতো দুরূহ অঙ্গের চিকিৎসা তিনি করেন বহু যত্ন নিয়ে এবং ভীষণ মনোযোগ দিয়ে এবং সফল হন। তবে খুব অল্প অপারেশনই তিনি করেন।

একটু প্রতিষ্ঠিত হবার পরে মা বাবা চাইলেন ছেলেকে সংসারী করতে, কিন্তু তিনি রাজি নন। মা বাবাও ভীষণ ধর্মপ্রাণ মানুষ, তাঁরাও রামঠাকুরের দীক্ষিত, আবার প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দরের ভক্ত। প্রতি বছর প্রভু জগদ্বন্ধুর জন্মতিথির আগে গিয়ে একমাস ডাহাপাড়ায় থেকে তাঁরা শ্রম দেন প্রভু জগদ্বন্ধুর আশ্রমে। বিমলেশও রামঠাকুরের দীক্ষিত এবং প্রভু জগদ্বন্ধুর ভক্ত। তিনি ভারত সেবাশ্রমের সেবাধর্মে পুরোপুরি নিয়োজিত করতে চাইছিলেন। কিন্তু সন্ন্যাসদীক্ষা ছাড়া আশ্রমের সেবাব্রতে সামিল হতে পারছিলেন না। আজ বহুবছর তিনি ভারত সেবাশ্রমে বিনা পয়সায় লোকের চোখের চিকিৎসা করেন। ভারত সেবাশ্রমের কেউ তাঁর কাছে চোখ দেখালে তিনি সতীর্থ মনে করে ভিসিট নেন না। ভারত সেবাশ্রমে এবং তাঁর হাসপাতালে লোকে তাঁকে ডাকে ‘সাধু ডাক্তার’ বলে। অন্য অনেক নার্সিংহোম ও অন্য হাসপাতালের চোখের ডাক্তারেরা বিমলেশের কাছে আসেন দুরূহ কোনো চোখের চিকিৎসার ব্যাপারে পরামর্শ করতে। বিমলেশের মা বাবা এখন মেনে নিয়েছেন তাঁর এই সেবাধর্ম আর আশ্রমের প্রতি, ঈশ্বরের প্রতি একাগ্রতা। তিনি নিয়ম করে এখন ভারত সেবাশ্রমে গীতা, উপনিষদ, সনাতন শাস্ত্রের ক্লাস নেন।

BANGLADARSHAN.COM

করোনার কোপে তিন মাসের ভেতরে চলে গেলেন বিমলেশের মা বাবা। বিমলেশ খুব ভেঙে পড়েছিলেন প্রিয়জন বিয়োগে। কিছুতেই মা বাবার চলে যাওয়াটা মেনে নিতে পারছিলেন না। যদিও বহুবছর ধরে তিনি আশ্রমেই স্থায়ীভাবে বাস করেন, মাঝে মাঝে গিয়ে দেখে আসতেন মা বাবাকে। গতকাল ভারত সেবাশ্রমের তাপস মহারাজ তাঁকে জানালেন আগামী মকর সংক্রান্তিতে তিনি বিমলেশকে বিরজা হোম করে সন্ন্যাস দীক্ষা দেবেন। বিরজা হোম করে মস্তক মুন্ডন করে তিনি পূর্ণ সন্ন্যাস জীবন লাভ করতে পারবেন, এতদিন তিনি ব্রহ্মচারী ছিলেন। শুনে বিমলেশের মনটা অনাবিল আনন্দে ভরে গেল। বহু প্রতিক্ষিত এই দিনটার জন্য তিনি এতো বছর ধরে ধৈর্য্য ধরে বসে ছিলেন। নিয়মমত সন্ন্যাস দীক্ষার অব্যবহিত পরে তাঁকে বেরোবে হবে

পরিব্রাজনায়, সেটাই সন্ন্যাসীর আসল পরীক্ষা। মনে মনে শতকোটি প্রণাম জানালেন তাঁর ইষ্টকে তাঁকে এভাবে জীবনের এই পর্যায়ে নিজের শরণে টেনে নেবার জন্য এবং তাঁর মনোস্কামনা পূর্ণ করে তাঁকে সন্ন্যাসীর সেবাধর্মে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য।

BANGLADARSHAN.COM

॥হরিগুণ॥

মুঘল আমলে সম্রাট আকবরের শাহী দরবার, বিক্রমদিত্যের নবরত্নের সভার নজন গুণীজনের মতো আকবরের দরবারেও আছেন নজন গুণীজন নিয়ে নবরত্ন। তাঁদেরই একজন সঙ্গীত সম্রাট মিঞা তানসেন। তানসেন সম্রাট আকবরের শুধুই সভাগায়কই নন, তিনি সম্রাট আকবরের নিকটজনও ছিলেন। তানসেনকে "মিঞা" উপাধি দিয়েছিলেন সম্রাট আকবর যে ফার্সি শব্দ "মিঞা"টি ব্যবহার হয় অত্যন্ত সম্মানজনক ব্যক্তি বোঝাতে।

তানসেন বা রামতনু পাণ্ডের বাবা মুকুন্দ বা মকরন্দ পাণ্ডে ছিলেন গবালিওরের একজন বিশেষ গুণী কবি ও গায়ক যিনি কিছুদিন কাশীতে ছিলেন মন্দিরের পূজারী হিসাবে। তানসেনের জন্ম গবালিওরে, তানসেন নিজে মধ্যপ্রদেশের গবালিওর ও তার আশেপাশে জায়গায় সঙ্গীতের তালিম নেন ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে। তানসেন আদতে ছিলেন রেওয়ার রাজা রামচন্দ্র সিংহের সভাগায়ক, রামচন্দ্র সিংহের সঙ্গে মিলে তিনি বহু সঙ্গীত রচনাও করেছিলেন, রামচন্দ্র সিং নিজেও ছিলেন সংগীতজ্ঞ ও সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষক। তানসেনের অপূর্ব সঙ্গীতের খ্যাতি সম্রাট আকবরের কানে পৌঁছয় এবং তিনি তানসেনকে রেওয়ার রাজা রামচন্দ্র সিংয়ের কাছে চেয়ে পাঠান। তানসেন যেতে রাজি ছিলেন না, কিন্তু রামচন্দ্র সিং তাঁকে জোর করে পাঠান আকবরের দরবারে যাতে গোটা ভারত তানসেনের সঙ্গীতের রসাস্বাদন করতে পারে এবং তানসেনের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে সারা দেশে। রাজা রামচন্দ্র সিংয়ের সেই আশায় সর্বার্থে সফল হয়েছিল।

BANGLADARSHAN.COM

তানসেনের সঙ্গীতের গুরু ছিলেন পরমবৈষ্ণব সাধক ও সংগীতাচার্য স্বামী হরিদাস বা হরিদাস স্বামী যিনি ছিলেন অতুলনীয় ধ্রুপদীয়া। ধ্রুপদ বা "ধ্রুব পদ" সাধারণত তাঁরাই সুচারুরূপে আয়ত্ত করতে পারেন যাঁরা মনেপ্রাণে ঈশ্বরে নিবেদিত প্রাণ, সঙ্গীতের রাগ রাগিনীর মূর্ত রূপকে এঁরা সাধনবলে প্রত্যক্ষ করেন, হরিদাস স্বামী ছিলেন সেই বিরলের মধ্যে বিরলতম একজন। তানসেনের মাত্র ছ বছর বয়সে তাঁর সংগীত প্রতিভার চমৎকার দেখান এবং পরবর্তীকালে হরিদাস স্বামীর সাহচর্য ও শিক্ষায় বহু ধ্রুপদ ও শাস্ত্রীয় সঙ্গীত রচনা করেন ব্রজভাষা ও হিন্দীতে। তাঁর অসামান্য সঙ্গীত প্রতিভার জন্য গবালিরের রাজা মানসিংহ তোমর যিনি নিজেও একজন সঙ্গীতের অসাধারণ সমজদার ছিলেন রামতনু পাণ্ডেকে 'তানসেন' উপাধি দেন। সেই সময়ের গায়ক ছিলেন তানসেন যে সময় সংস্কৃত ভাষা থেকে বেরিয়ে সঙ্গীত স্থানীয় ভাষায় একটু একটু করে রূপ নিচ্ছে। কথিত আছে, তানসেন রাগ মিয়ামল্লার বা জয়জয়ন্তী গেয়ে বৃষ্টি নামাতেন আবার রাগ দীপক গেয়ে রোদ্দুর বা তাপ আনতে পারতেন।

তানসেনের গানে মুগ্ধ আকবরের মনে একবার প্রশ্ন জাগে যে তানসেনই কী সর্বশ্রেষ্ঠ গায়ক না তাঁর চেয়েও শ্রেষ্ঠতর আরো কেউ আছে। এই প্রশ্নটি তিনি সরাসরি তানসেনকেই জিজ্ঞাসা করেন। তানসেন বলেন যে তাঁর চেয়েও শ্রেষ্ঠতর যিনি তাঁর দেখা পেতে হলে সম্রাটকে নিজের মুকুট ও রাজবেশ ছেড়ে তানসেনের সঙ্গে যেতে

হবে। কারণ তাঁর শাসনে বয়ে চলেন পুতপবিত্র যমুনা নদী। তাঁর সুমধুর কণ্ঠের শাসনে যমুনামাই বাঁধা পড়েছেন। সম্রাট আকবর তানসেনের কথা শুনে রাজবেশ আর মুকুট ত্যাগ করে চললেন তানসেনের সঙ্গে বৃন্দাবনের যমুনাতীরে যেখানে তানসেনের সঙ্গীতগুরু হরিদাস স্বামী বসে গান গাইছেন, কেবল একটি মহার্ঘ্য মুক্তোর মালা সঙ্গে নিলেন।

এগিয়ে চলেছেন সম্রাট আকবর তানসেনের সঙ্গে। বৃন্দাবনের নিধুবনের বহু আগে থেকে আকবরের কানে ভেসে আসছে সুমধুর সঙ্গীত, শান্ত ধীর যমুনার তীর ধরে মৃদু পদচারণায় অবশেষে তিনি গিয়ে পৌঁছলেন হরিদাস স্বামীর সামনে নিধুবনের মন্দির প্রাঙ্গণে। আকবরকে দেখে কৃষ্ণের দাস হরিদাস স্বামী তাঁর গান থামিয়ে বললেন, “কী ব্যাপার ভারত সম্রাট মহামান্য নৃপতি, যমুনা নদীর তীরে আমার কাছে কী প্রয়োজনে? সারা বৃন্দাবনবাসীতো আসে আমার গানের টানে।” আকবর বললেন, “আমি হতবাক হয়ে গেলাম, এতো চেষ্টা করে মুকুট আর রাজবেশ ত্যাগ করে এলাম, তাও আপনি ধরে ফেললেন?” হরিদাস স্বামী বললেন, “তোমার কপালের রাজতিলক তুমি মুছে এসেছো ঠিকই কিন্তু তার আভা এখনও মুছেও মুছতে পারোনি।” কিছু কথা বলার পরে একটি একটি করে গান গাইতে লাগলেন সাধক হরিদাস স্বামী আর আকবরের চোখ দিয়ে সে গান শুনে অবিরল জলধারা ঝরতে রইল। হৃদয় তাঁর দিব্য আনন্দে পূর্ণ, অন্তরে অনাবিল প্রশান্তি অনুভূত হল আকবরের।

BANGLADARSHAN.COM

গান শেষ হলে আবেগে আপ্লুত সম্রাট সেই বহুমূল্য মুক্তোর হার যখনই দিলেন হরিদাস স্বামীর হাতে হরিদাস স্বামী হঠাৎ সেই হার যমুনার জলে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। এই ঘটনা দেখে সম্রাট আকবরের অহমিকায় আঘাত লাগল, তিনি রক্তচক্ষু হয়ে রেগে গর্জন করে উঠলেন, “এতো সাহস তোমার!!! সম্রাট আকবরের দেওয়া উপহারকে ছুঁড়ে যমুনার জলে ফেলার মত স্পর্ধা তোমাকে কে দিয়েছে? এখুনি হার ফেরত দাও, নাহলে যে গলায় গান গাইলে তার মুন্ডুটা গর্দানে গিয়ে মাটির ধুলোয় গড়াগড়ি খাবে।”

সে কথা শুনে পুরবীর অপূর্ব তানে গান ধরলেন হরিদাস স্বামী। সেই গান শুনে মন্দিরের প্রাঙ্গণে একে একে তিনটে হরিণ গলায় তিনটে মুক্তোর হার পরে এসে উপস্থিত হল। স্তম্ভিত আকবর স্থির করে উঠতে পারছেন না কোনটা তাঁর দেওয়া সেই মুক্তোর হার? আকবর এরপরে দেখেন একে একে যত হরিণ বেরিয়ে আসছে সবার গলায় আকবরের মুক্তোর হার। স্তম্ভিত আর অভিভূত আকবর এসব দেখে বেসামাল হয়ে এবারে হরিদাস স্বামীর পায়ে ধরে বললেন, “গুরু মহারাজ, আপনিই যে সর্বশ্রেষ্ঠ সেটা রাজকোষের মোহে অন্ধ আমি এভাবে আগে বুঝিনি। সঙ্গীতের অনুরাগে আমার কৃপণের ধন শূন্য হয়েছে, আমার রাজৈশ্বর্যের অহমিকা আমাকে অন্ধ করে দিয়েছিল। মুকুটের ভারে যে দুর্গতি আমার হল, তাঁর জন্য আমার লজ্জার শেষ নেই। তাই আমার হৃদয়কমল আপনার চরণে সমর্পণ করলাম।” এই কথা বলে সম্রাট আকবর থামলেন, তিনি এতো বড় কৃপণও নন যে নিজেকে সমর্পণ করতে পারবেন না, তাই তিনি হরিদাস স্বামীর সামনে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তিনি হরিদাস স্বামীকে অনুরোধ করলেন তাঁর সঙ্গে তাঁর শাহী দরবারে গিয়ে সভাগায়কের পদটি অলংকৃত করতে যার উত্তরে হরিদাস স্বামী বললেন, “আমার সব সঙ্গীতই প্রভু হরির জন্য, যে যেভাবে শোনে

আর ভাবে, সেভাবেই তা তাদের কাছে ধরা দেয়, আমি শুধু তাঁরই দাস। কারুর ব্যক্তিগত সভায় যেতে অপারগ, বিশ্বপ্রভু হরির বিশ্বের দরবারের আমি চিরগায়ক, তাঁর সভা ছেড়ে যাওয়ার আমার উপায় নেই, আমি তাঁর প্রেমেই বাঁধা, তিনি আমার হৃদবিহারী অনন্তের অধিপতি।” একথা বলে হরিদাস স্বামী তাঁকে আশীর্বাদ করে আবার হরিগুণ গাইতে বসলেন। তিনি হরির দাস, হরিদাস।

BANGLADARSHAN.COM

॥ভক্তবৎসল কেদারনাথ॥

শিবের স্তবের মধ্যে রুদ্রাষ্টকম স্তবটি আমার বিশেষ পছন্দের:

প্রভুং প্রাণনাথং বিভুং বিশ্বনাথং
জগন্নাথ নাথং সদানন্দ ভাজাম।
ভবদ্ভবয় ভূতেশ্বরং ভূতনাথং,
শিবং শংকরং শম্ভু মীশানমীডে॥ ১॥

গলে রুন্ডমালং তনৌ সর্পজালং
মহাকাল কালং গণেশাদি পালম।
জটাজূট গংগোত্তরংগৈ র্বিশালং,
শিবং শংকরং শম্ভু মীশানমীডে॥ ২॥

মুদামাকরং মন্ডনং মন্ডয়ংতং
মহা মন্ডলং ভস্ম ভূষাধরং তম।
অনাদিং হ্যপারং মহা মোহমারং,
শিবং শংকরং শম্ভু মীশানমীডে॥ ৩॥

BANGLADARSHAN.COM

জটাধো নিবাসং মহাট্টাট্টহাসং
মহাপাপ নাশং সদা সুপ্রকাশম।
গিরীশং গণেশং সুরেশং মহেশং,
শিবং শংকরং শম্ভু মীশানমীডে॥ ৪॥

গিরীংদ্রাত্মজা সংগৃহীতার্ধদেহং
গিরৌ সংস্থিতং সর্বদাপন্ন গেহম।
পরব্রহ্ম ব্রহ্মাদিভির-বংদয়মানং,
শিবং শংকরং শম্ভু মীশানমীডে॥ ৫॥

কপালং ত্রিশূলং করাভ্যাং দধানং
পদাম্ভোজ নম্রায় কামং দদানম।
বলীবর্ধমানং সুরাণাং প্রধানং,
শিবং শংকরং শম্ভু মীশানমীডে॥ ৬॥

শরচ্চংদ্র গাত্রং গণানন্দপাত্রং
ত্রিনেত্রং পবিত্রং ধনেশস্য মিত্রম।
অপর্ণা কলত্রং সদা সচ্চরিত্রং,
শিবং শংকরং শম্ভু মীশানমীডে॥ ৭॥

হরং সর্পহারং চিতা ভূবিহারং
ভবং বেদসারং সদা নির্বিকারং।
শ্মশানে বসন্তং মনোজং দহন্তং,
শিবং শংকরং শম্ভু মীশানমীডে॥ ৮॥

দেবতাত্মা হিমালয় আর তাঁর গিরিগুহায়, নদীতীরে, কন্দরে কন্দরে ছড়িয়ে রয়েছে কত না দিব্যধাম, পুণ্যক্ষেত্র আর পীঠস্থান। হিমালয় দেবভূমি আর শিবক্ষেত্র গাড়োয়াল সেই দেবভূমির অংশ বিশেষ। সেই গাড়োয়াল হিমালয়ের অন্তর্গত ছোটা চারধাম, কেদারনাথ, বদ্রীনাথ, গঙ্গোত্রী আর যমুনোত্রী। এই চারধামের প্রথমটি কেদারনাথ, যেটি একটি শিবক্ষেত্র এবং হিমালয়ের কোলে একমাত্র জ্যোতির্লিঙ্গ, যা দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্তর্গত। ভারতের মানচিত্রে উত্তরে কেদারনাথ থেকে দক্ষিণে রামেশ্বরম পর্যন্ত একই সরল রেখায় অবস্থিত। মহেশ্বর শিব স্বয়ং মোক্ষদাতা। হিন্দু শাস্ত্র মতে জীবন মৃত্যুর এই চক্র থেকে মুক্তি দিয়ে মোক্ষ দান করেন শিব। তাই তো আবহমান কাল ধরে মোক্ষলোভী মানুষ বারবার ছুটে যান আশুতোষ দেবাদিদেবের দরবারে।

BANGLADARSHAN.COM

সময়টা ২০০৩ সাল। মেয়ে সবে পাঁচে পড়েছে, তার স্কুলের সামার ভ্যাকেশন শুরু হয়েছে মে মাসের মাঝামাঝি। মেয়ের বাবা সেই সময় মাসের মধ্যে কুড়ি দিন ট্যুরে থাকে, তাই বাড়ি, অফিস, মেয়ের পড়াশোনা, স্কুল সব নিয়ে খুবই ব্যস্ত আমি। সময় সময় যেন হাঁপিয়ে উঠছি। সেবার আমরা ঠিক করলাম এবার কর্তা ফিরলে আমাদের বেড়াতে নিয়ে যেতেই হবে। সেকথা বললামও ফেরার পরে। ফেরার পর যেদিন অফিসে গেল, সেদিন দুপুরের দিকে ফোন করে জিজ্ঞেস করল যে কেদারবদ্রী যেতে চাই কিনা, সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে গেলাম। সন্ধ্যেবেলায় বাড়ি এসে বলল যে কুন্ডু স্পেশালের সঙ্গে বুকিং হয়েছে হরিদ্বার টু হরিদ্বার, কারণ কলকাতা টু কলকাতার ট্রেন রেজারভেশন ওদের আগেই হয়ে গেছে, সঙ্গে টাকা ছিল না এক কলিগ সাহায্য করেছে। কেদার বদ্রী যাত্রায় কুন্ডু স্পেশাল বলেই দেয় যে হরিদ্বার থেকে গোটা রাস্তা তারা নিরামিষ খাবার দেবে কারণ এটা তীর্থপথ আর গোটা রাস্তাই নিরামিষ বলয় বা গোবলয়। এরপর ঠিক হল আমরা রাজধানী এক্সপ্রেসে দিল্লী গিয়ে ওখান থেকে জনশতাব্দীতে হরিদ্বার যাব, এখান থেকে জনশতাব্দীর রেজারভেশন বা টিকিট কিছুই পাওয়া গেল না, সবটাই দিল্লীতে গিয়ে করতে হবে।

সেইমত মে মাসের শেষের দিকে আমরা রাজধানী এক্সপ্রেসে চড়ে রাজধানী দিল্লী পৌঁছলাম বেলা এগারোটায়। কিন্তু জনশতাব্দীর টিকিট পাওয়া গেল না, দিল্লীতে তখন ৪৬ ডিগ্রি গরম চলছে, তার মধ্যে ছোটাছুটি করে এক ট্রাভেল এজেন্টের সাহায্যে এসি বাসের টিকিট কেটে তাতে চড়ে বসলাম, ৭০ সিটের বাসে ওই গরমের জন্য

লোক মাত্র পনের জন, বাস দিল্লী থেকে বেলা তিনটেতে ছেড়ে আমাদের হরিদ্বারের গঙ্গার পোলের ওপর রাত নটায় নামিয়ে দিয়ে চলে গেল। সেখান থেকে রিক্সাতে করে এসে উঠলাম সেই হোটেলে যেখানে কলকাতা থেকে কুন্ডু স্পেশাল তার আরো যাত্রী নিয়ে উঠেছে। পরেরদিন টা হরিদ্বারে থেকে হর কি পৌরিতে গঙ্গা আরতি দেখে তার পরেরদিন সকাল ছটায় শুরু হল আমাদের যাত্রা। আমাদের গন্তব্য সীতাপুর যেখানে রাত্রিবাস করে পরেরদিন কেদারনাথ যাত্রা শুরু হবে। হরিদ্বার থেকে সীতাপুরের দূরত্ব ২৩০ কিমি।

তিনটে বাস চলেছে কুন্ডু স্পেশালের, যাত্রী প্রায় দেড়শ, সর্বকনিষ্ঠ সদস্যা আমার ছোট্ট মেয়ে, তাই সে একটু মনযোগও পাচ্ছে, বিশেষত দুজন ম্যানেজার, গৌতমবাবু আর রজত বাবুদের। প্রকৃতি যেন অকৃপণ হাতে তার সৌন্দর্য সম্ভার ঢেলে সাজিয়েছে তার এই একান্ত আপনার রাজ্যটিকে। ভেবেছিলাম বাসে উঠে ঘুমোব, কিন্তু এই আশ্চর্য সৌন্দর্য না দেখলে যে অপ্রাপ্তিতে দুঃখ হবে, ঘুরে ঘুরে বাস চলেছে গঙ্গার পবিত্র ধারাকে সঙ্গী করে, ঋষিকেশ ছাড়িতে ব্যাসীতে আমাদের প্রাতঃরাশ ও প্রাকৃতিক প্রয়োজনকে মাথায় রেখে বাস বিরতি দিল একটু। আবার চড়েইবেতি বলে এগোনো। হঠাৎ রাস্তার পাশে পাহাড় সংলগ্ন জঙ্গল থেকে নিজেদের মধ্যে খেলা করতে করতে দুটো ধূসর রঙের হিমালয়ান জায়ান্ট কাঠবেড়ালী বাসের পাশের রাস্তায় পড়ল, পড়েই তীব্র বেগে দৌড়ে জঙ্গলে ঢুকে গেল। যেতে যেতে দেখছি নদীর পাশের পাহাড়ের পাকদন্ডী বেয়ে লোকজন জিনিস পত্র নিয়ে হেঁটে হেঁটে চলেছে, কি কঠিন আর কষ্টসাধ্য তাদের জীবনযাপন। পাশের পাহাড়ের ওপরের রাস্তা দিয়ে আসছে একটা গাড়ি, একটু পরে আমাদের বাসের পাশ দিয়ে সেটা চলে গেল, এবার সেই পাহাড়টাতে আমাদের বাস চলেছে আর সেই গাড়িটা আমরা যেখানে ছিলাম, সেখান দিয়ে চলেছে। পথে পেরিয়ে এলাম ঋষিকেশ, লছমনঝুলা, দেবপ্রয়াগ। মুগ্ধ বিস্ময়ে শুধু ভাবছি সত্যিই দেবভূমি, ভারতের আধ্যাত্মিক আত্মা নিহিত আছে এই স্থানগুলিতে। রুদ্রপ্রয়াগ থেকে রাস্তা দুদিকে ভাগ হয়ে একটা গেছে কেদারনাথ আর একটা যোশীমঠ হয়ে বদ্রীনাথ। মাঝে শ্রীনগরে দুপুরের খাবার খেয়ে আমরা অগস্তমুনি, গুপ্তকাশী, ফাটা, কুন্ড ছাড়িয়ে এগিয়ে চলেছি সীতাপুরের দিকে, অবশেষে বেলা চারটেতে আমরা পৌঁছলাম সীতাপুর, ওখানে পাহাড়ের কোলে একটা হোটেলে থাকবার ব্যবস্থা হোটেলের পাশেই রাস্তা আর রাস্তার পরেই খাদ, ঘন পাইন বনের জঙ্গল নীচে, তার ঠিক পেছনে দৃশ্যমান কেদারনাথ শৃঙ্গ, পূর্ণিমা নিকটে বলে সে যেন রাত্রে রূপোর মুকুট পরে আহ্বান করছে, আর চারদিকে তারায় ভরা আকাশ, হোটেলের বারান্দা থেকে যেন ছোঁয়া যায়, যদিও ঠান্ডার জন্যে বাইরে দাঁড়ানো বেশ কষ্টকর।

BANGLADARSHAN.COM

গৌরীকুন্ডের উষ্ণ প্রস্রবন দেখে সকলে ব্যস্ত হয়ে পড়ল, কেউ ঘোড়া নিল, কেউ ডান্ডি নিল, কেউ কান্ডি নিল। সকলেই লাঠি নিল পাহাড়ে চড়ার জন্য, লাঠি আমরাও নিলাম আর নিলাম মেয়ের জন্য একটা পিট্ঠু আর লাগেজের জন্য একজন পোর্টার। কলকাতা থেকে যাওয়ার সময় পাহাড়ে ঘোরার ব্যাপারে একজন শিক্ষক বলে দিয়েছিলেন যে ঘোড়ায় গেলে পুণ্য ঘোড়ায় পায়ে, ডান্ডি/কান্ডিতে গেলে পুণ্য ডান্ডি/কান্ডি ওয়ালাদের, নিজের পায়ে গেলে পুণ্য নিজের। শুরু হল যাত্রা। ভ্রমণকে কেন শিক্ষার অঙ্গ বলে এই যাত্রায় এলে বোঝা যায়। ত্রিতাপদগ্ধ মানুষ শান্তির আশায় বারে বারে ছুটে আসে তীর্থদেবতার কাছে তার তাপ নাশের প্রার্থনা নিয়ে।

ধনী দরিদ্র, উচ্চ নীচ, ইতর ভদ্র, গৃহী সন্ন্যাসী সকলেই মোক্ষ লাভের আশায় এগিয়ে চলেছে। তীর্থপথের তাপ সহ্য না করলে তপস্যা হবে কি ভাবে আর তীর্থের ফল তীর্থপতি বরদান করবেন কেন? বাবা কেদারনাথ যে স্বয়ং আশুতোষ, ভক্তবৎসল, পরম কারুণিক, তিনি শুধু চান ভক্তের নিখাদ ভক্তি আর প্রেম। করুণানিধান মহাদেব বারে বারে তাঁর ভক্তকে আহ্বান করেন তাকে অভয়পদের আশ্বাস দিতে। রাস্তায় চলতে চলতে ভাবছি এই পথ ধরে যুগে যুগে কত যোগী, সাধু, মহাত্মা, সন্ত গেছেন সেই পরম পুরুষের টানে, কত মহানের পদ রজঃ মিশে রয়েছে এই পথের ধূলিকণায়। পথ কিন্তু দুর্গম, তার মধ্যে ঘোড়ার নাদি আর বৃষ্টির জলে পুরো রাস্তাই কর্দমসিক্ত, তার সঙ্গে ঘোড়ার নাদের কটু গন্ধ মিশে একেবারে পিচ্ছিল রাস্তা দুর্গন্ধে ভরে রয়েছে। প্রায় প্রত্যেকেরই নিম্নবাস কর্দমাক্ত হয়ে গেছে। তবু এগিয়ে চলা তাঁর ডাকে সারা দিতে, সত্য সুন্দর শিব ডেকে এনেছেন কৃপা করে, সেই কৃপায় সব বাঁধা দূরে সরিয়ে তিনি টেনে নিয়ে চলেছেন, এই যাত্রার তিনিই যে কর্ণধার, আমরা তাঁর অনুসারী মাত্র। সকল বাঁধা ঘুচিয়ে যিনি টানছেন, তাঁর কৃপা না হলে সব পর পর তিনি সাজিয়ে দিচ্ছেন কেন? পাহাড়ী পাকদন্ডী বেয়ে রাস্তা ঘুরে ঘুরে উঠেছে, একটু চললেই হাঁপ ধরছে, কিন্তু এমনি অসাধারণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য যে একটু দাঁড়িয়ে তাকে দেখে "ওঁ নমঃ শিবায়" জপ করতে করতে আবার একটু শক্তি সঞ্চয় করে এগিয়ে চলা। পথের একদিকে খাড়া পাহাড়, আর একদিকে খাদ, সেই খাদের পাশ দিয়ে নীলবর্ণা অপরূপা মন্দাকিনী ছুটে চলেছে আর তার অপর পাড়ে পাহাড়ের কোলে অজস্র ভেড়া চরছে, রাস্তা একটু নিস্তব্ধ হলে তাদের গলার ঘণ্টার আওয়াজ কানে আসছে। কেদারনাথ শৃঙ্গের পেছনে চোরাবাড়ি তাল থেকে বেরিয়েছে মন্দাকিনী নদী, যা কেদারনাথের গোটা রাস্তাতেই নিরন্তর সঙ্গ দান করে ছুটে চলেছে তার সঙ্গমের দিকে। গৌরীকুন্ড থেকে কেদারনাথ তখন ছিল ১৪ কিমি রাস্তা।

BANGLADARSHAN.COM

পরেরদিন ভোরে উঠে স্নান সেরে তৈরী হতে হল, সেদিন শোনপ্রয়াগ হয়ে গৌরীকুন্ড থেকে কেদারনাথ যাত্রা। বেশিরভাগ জিনিস সীতাপুরে রেখে শুধু শুকনো খাবার, জল, রেনকোট, ছাতা, একসেট করে ধোয়া জামাকাপড় পুজো দেবার জন্য আর গরম জামাকাপড় নিয়ে বাসে উঠলাম, বাস শোনপ্রয়াগ দিয়ে গৌরীকুন্ডে দাঁড়াল।

মেয়ের পিঠ্ঠুর সাথে চলেছে তার বাবা, পিঠ্ঠুর লোকটি পাহাড়ী মানুষ, তার কাছে এই রাস্তা অনায়াসে চলার উপযোগী, আর মেয়ের বাবা সাথে তাল রাখতে গিয়ে প্রায় ছুটছে, যেখানে আমার সঙ্গে দেখা হচ্ছে বলছে, "বুঝলে হাঁটু খুলে হাতে চলে আসবে ওর সাথে তাল দিতে গিয়ে", বলেই আবার দৌড়োচ্ছে। চলতে চলতে আমরা কয়েক জায়গায় দাঁড়িয়েছি, লেবুর জল আর ছোলা সেদ্ধ খেয়েছি, ক্রমে পেরিয়ে এলাম রামওয়ারা, গরুড়চটি। রামওয়ারা থেকে বেরিয়ে একটু এগিয়েই বৃষ্টি নামলো, রেনকোট বার করতে করতে ভিজে গেলাম, আর গরুড় চটিতে মেয়ের বাবার ভালো লাঠিটা কেউ নিয়ে একটা ভাঙা লাঠি রেখে গেল আমরা যখন লেবুর জল খাচ্ছিলাম। এভাবে এগিয়ে চলেছি, মনে মনে তারক ব্রহ্ম নাম জপ করে চলেছি। পথে আলাপ হল বেহালা থেকে আসা একটি পরিবারের সাথে, এটা তাদের দ্বিতীয় বার আসা, প্রথমবার তাদের কেদারনাথের দর্শন হয়নি পথে ধ্বস নামার জন্যে, এবার আবার এসেছেন দর্শনের জন্য, পরে শুনেছিলাম এবারেও তাদের দর্শন

হয়নি ভদ্রলোকের স্ত্রী হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় গরুড় চটিতে। তারা ওখান থেকেই ফেরত আসে। ভগবান যে কতভাবেই তাঁর ভক্তের পরীক্ষা নেন!

ঠিক কেদারনাথের দুই কিলোমিটার আগে মুষলধারে বৃষ্টি নামল, সামনে পিছনে, আশে পাশে কিছু দেখা যাচ্ছে না এমন বৃষ্টি, আমার চশমা পুরো ঝাপসা হয়ে গেছে, আর এমন জায়গায় যেখানে কোনো গাছপালা, বাড়ি ঘর কিচ্ছু নেই, চিন্তিত হয়ে করণীয় কি ভাবতে ভাবতে হাঁটছি, এমন সময় দেখি একটা ছোট্ট পাথরের তৈরী দোকানের ভেতর থেকে মেয়ে আর তার বাবা ডাকছে, গিয়ে দেখি সেটা একটা চায়ের দোকান, আমি ঢুকতেই দোকানদার দোকানের সামনের প্লাস্টিক আর চটের দরজাটা বন্ধ করে দিল বৃষ্টির ছাট থেকে বাঁচতে, আমাদের গরম দুধের ঘোরালো চা দিল, দেখি সেখানে আমাদের পিট্ঠুর লোকটি আর পোর্টার দুজনেই আছে, বেশ ঘণ্টাখানেক পরে বৃষ্টি থামলে আমরা বেরোলাম। ওই বৃষ্টিতে ওই দোকানে আশ্রয় না পেলে জানিনা কি হতো। আবার হাঁটতে হাঁটতে শেষে বেলা প্রায় চারটে নাগাদ পৌঁছলাম কেদারনাথ। দেখি মন্দাকিনীর পুলের ওপর ম্যানেজার গৌতমবাবু আর রজতবাবু দাঁড়িয়ে, বললেন, “সবাই এসে গেছে, আপনিই লাস্ট”, আমার দেরী দেখে ওঁরা এগিয়ে এসেছিলেন। কেদারনাথে আমরা ছিলাম ভারত সেবাশ্রম সংঘের দোতলার একটি ঘরে।

সেই ঘরে ঢুকে দেখি মেয়ে আর তার বাবা মালপত্র সহ আগেই সেখানে স্থিত, সঙ্গে রয়েছেন সুভাষদা আর শিপ্রাদি বলে এক বয়স্ক দম্পতি, যাঁরা আমাদের মতো হেঁটে এসেছেন, কিন্তু পথের তুষার বৃষ্টিতে সুভাষদার ফেসিয়াল প্যারালাইসিস হয়ে মুখ বেঁকে গেছে, তার ওপর দুজনেরই শ্বাসকষ্ট শুরু হয়েছে। মেয়ের বাবার, মেয়ের, আমারও শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল। এদিকে মেয়ের বাবার জিন্সের প্যান্ট, উলের মোজা, জুতো সব ভিজে একসা। ঘরে চা দিতে এসে স্থানীয় ছেলেটি আমায় পরামর্শ দিয়ে গেল যে যেখানে জেনারেটার চলছে সেই জায়গার আশে পাশে এই জিনিসগুলো মেলে দিতে, জেনারেটরের ধোঁয়াতে একটু শুকোবে, তাই করলাম, তার পরে গেলাম সন্ধ্যারতি দেখতে। অপূর্ব সেই আরতি কিন্তু শীতে যে জমে যাচ্ছি, সেদিন ছিল ওখানে মাইনাস তিন ডিগ্রী তাপমাত্রা। তাই ফিরে এসে আর খাবার জন্য নীচে নামিনি, সকলেই সুভাষদা, শিপ্রাদি সহ ওখানে বলে গরম জল নিয়ে দুধ গুলে, বিস্কুট, মিষ্টি, কাজু কিসমিস দিয়ে রাত্রের খাবার খেয়ে হোমিওপ্যাথি ওষুধ কোকা খেলাম ঘরের সকলে ওই শ্বাসকষ্ট লাঘব করতে। বেশ আরাম হল, শোবার আগে ম্যানেজার গৌতমবাবু বলে গেলেন জানলা একটা খুলে শুতে, কারণ অক্সিজেন ক্রাইসিস হতে পারে এতো উঁচুতে। তাই করা হল। বাইরে তখন পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় স্নাত হচ্ছে প্রকৃতি, চারিদিক এক অপার্থিব আলোয় ভরে গেছে, জানলা দিয়ে সেই সৌন্দর্য সুধা দুচোখে ভরে নিতে নিতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি। পরেরদিন ভোরে কর্তা ডেকে দিলেন তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে সকালের আরতি আর পুজো দেখতে যাবার জন্য। কিন্তু কর্তার প্যান্ট, মোজা সবই তো ভিজে, লাগেজ ভিজে যাবার ভয়ে তিনি দ্বিতীয় সেট প্যান্ট, মোজা আনেননি, শেষে তাঁর উলের ড্রয়ারের ওপরে আমার সালোয়ার চাপিয়ে আর উর্ধাঙ্গে উলিকটের গেঞ্জি আর তার ওপর সোয়েটার চাপিয়ে মন্দিরে গিয়ে আরতি দেখলাম, শিবলিঙ্গ স্পর্শ করে লিঙ্গাষ্টকাম পাঠ করতে করতে পুজো দিলাম। পাশে আদি

BANGLADARSHAN.COM

শঙ্করাচার্যের সমাধি দর্শন করে প্রাণের প্রণতি জানালাম তাঁকে, কারণ তিনি না থাকলে আজকের হিন্দু ধর্মের পুনরুত্থান কে করতেন?

এবার আবার নামার পালা। ভারত সেবাশ্রমে ফিরে এসে পিট্ঠুর লোকটি আর পোর্টার দুজনেই এসে গেছে, তাদের নিয়ে নীচে এসে বেরোনোর সময় গৌতমবাবু বললেন কিছু খেয়ে যেতে, দেখলাম গরম খিচুড়ি, তারকারি আর চাটনি প্লেটে প্লেটে সাজানো, একটা প্লেট নিয়ে তার থেকে তিনজনে একটু একটু খেয়ে এগোলাম, কারণ পেটভরে খেলে হাঁটতে কষ্ট হবে। নামার সময় ঠিক হল সেই দোকানটিতে গিয়ে ওদেরকে অন্তত আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে যাব আমরা, যে দোকানটি আমাদের আগের দিন ওই প্রচন্ড বৃষ্টিতে আশ্রয় দিয়েছিল। সেই মতো কেদারনাথের পায়ে আমাদের অন্তরের কৃতজ্ঞতা ও প্রণতি জানিয়ে দুই কিমি নেমে এসে সেই দোকানটি খুঁজতে লাগলাম এগিয়ে, পিছিয়ে, কিন্তু কোনো দোকান, বাড়ি কিচ্ছু পাওয়া গেল না, আমাদের ঐভাবে খুঁজতে দেখে স্থানীয় কিছু লোক জিজ্ঞেস করলেন কি খুঁজছি, তাদের দোকানের কথা, আমাদের আশ্রয় দানের কথা সব জানালাম, তারা বললো গরুড় চটির পরে ওই জায়গা পুরো ফাঁকা মাঠের মতো, কোনো ঘরবাড়ি, দোকান ওখানে কখনো নেই। আমরা আগের দিনের কথা বলায় বললো, “হোগা কোই বাবাকা চমৎকার!” আমরা স্তম্ভিত হয়ে গেলাম, এই ঘটনার ব্যাখ্যা আজও আমাদের অজানা। রোজের জীবনের চলার পথে এমন কত কৃপার পরশ আসে, আমাদের মূঢ় মতিতে কতটুকু আমাদের বোধে আসে? যে অকারণ কৃপা পেয়েছি তা আমাদের সারাজীবনের সঞ্চয় হয়ে রয়েছে।

BANGLADARSHAN.COM

॥সমাপ্ত॥